প্রকাশক :
সঞ্জয় রায়
১৬, এন্টনীবাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৫৫

প্রচ্ছদ :
অশোক দীপক

ব্লক :
ভারতী আর্ট সার্ভিস, কলিকাতা-২৮

মুদ্রক
এ সি রায়
এ পি প্রেস
১৬এ, এন্টনীবাগান লেন
কলিকাতা-৯

অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম অধ্যায়

কী অসীম আনন্দেই না কেটেছিল আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম দুটি বছর!

পত্নী এমিলিয়ার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। সে আমায় ভালোবাসতো, আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। সে কি নিবিড় প্রেম! দুটি প্রাণ এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। রঙীন স্বপ্ন বিভোর মন, অবাধ সম্ভোগ, শান্ত জীবন। কপোত কপোতীর ন্যায় প্রেম-গুঞ্জন মুখর দিনগুলি সুখেই কেটে যাচ্ছিল। ক্ষনিকের জন্য কেউ কারো মুখ না দেখে থাকতে পারতাম না। কেবল মনের মধ্যে তখন ছিল প্রেম, প্রেম ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না তখন।

আমাদের অবস্থা ছিল, কবির ভাষায় "পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।" চিন্তা করতাম—প্রেমময়ী এমিলিয়ার কোন খুঁত নেই, সেও হয়তো মনে মনে ভাবতো স্বামী হিসাবে আমিও নিখুঁত। প্রেমের সম্মোহিনী শক্তিতে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। কখনও স্বপ্নে ভাবিনি, আমাদের প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গন একদিন আলগা হয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত ঝড়ে ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবে আমাদের শান্তির নীড়, সমাধি স্থাপন হবে এমন দুর্লভ ভালোবাসার, সেদিনের স্মৃতি আজীবন কাল বয়ে বেড়াতে হবে বিরহবেদনায় ও অনুতাপে।

আমার প্রেম যখন একভাবে রয়েছে, এমিলিয়ার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে অটুট, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ এমিলিয়ার চোখে ধরা পড়লো আমার ভুল, সে মনে মনে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, তার প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত করল, ভালোবাসল না আর।

এই কাহিনী তাই নিয়েই লেখা।

পরিপূর্ণ সুখ খালি চোখে দেখা যায় না। এই রটনাক হয়তো আজগুবি মনে হবে। তাই বুঝিয়ে বলছি—

তখন মাঝে মধ্যে জীবনটা বড় একঘেয়ে মনে হতো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। পরিনীতাকে ভালোবাসছি, তার পরিবর্তে পাচ্ছি ভালোবাসা। এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তখন কেউ যদি এসে বলতো—আমি সুখী, তাহলে আমি আশ্চর্য হয়ে বলতাম, না না, আমি সুখী নই। আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি, কিন্তু আমার অনাগত ভবিষ্যৎ সুখের নয়। একটা সস্তা দৈনিকের চিত্র সমালোচনা ও সাংবাদিকতা করে যা রোজগার হয় তাতে ভালোভাবে দিন চলে না। ফলে উদ্ধৃত ব্যয় তো দুরাশা—প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যেও কখনও অর্থের অনটনে পড়তে হয়। আমি আবার সুখী হবো কেমন করে?

কিন্তু আমি যখন নিজেকে সুখী বলে মেনে নিলাম, তখন ভাবি নি—আগেই আমি আসল সুখী ছিলাম।

দুবছর পরে আমার ভাগ্য ফিরলো। চিত্র নির্মাতা বাত্তিসতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তাঁরই জন্য লিখলাম আমার প্রথম চিত্রনাট্য। এটাই আমার পেশা দাঁড়ালো, আর এমিলিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে ক্রমশঃ ভাঁটা পড়তে লাগল।

আবার আমার গল্প আরম্ভ করি—

পেশাদার চিত্র সম্পাদক হিসাবে জীবন-যাপন আর আমার দাম্পত্য জীবনে অশান্তির বীজ একসঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছে। দুটি ঘটনাই অবিচ্ছেদ্য—

অতীতের একটা তুচ্ছ ঘটনার কথা আমার আজও মনে পড়ছে। প্রথমে তুচ্ছ মনে করেছিলাম, কিন্তু পরে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এমিলিয়া বাত্তিসতা আর আমি রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে বাত্তিসতা

অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য। আমরা আনন্দে রাজী হয়ে তাঁর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালাম। গাড়িতে দুটি মাত্র বসার জায়গা। গাড়ীর দরজা খুলে তিনি বললেন, মিঃ মলটেনি, গাড়ীতে শুধু একজনের জায়গা হবে। আপনি বরং এক কাজ করুন। কিছুক্ষণ এখানে আপনি অপেক্ষা করুন। ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আমি এমিলিয়ার দিকে তাকালাম। লক্ষ্য করলাম, ওর প্রশান্ত সুন্দর মুখে ফুটে উঠেছে অস্থিরতা, দুটি চোখ হয়ে উঠেছে চঞ্চল। বললাম, এমিলিয়া, তুমি বাত্তিসতার সঙ্গে যাও। আমি ট্যাক্সি করে আসছি।

আমার দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া অনিচ্ছা জড়িত কণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে বরং মিঃ বাত্তিসতা গাড়ীতে যাক, আমরা দুজন ট্যাক্সিতে যাই—

বাত্তিসতা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন—বাঃ, আপনারা তো বেশ! আমায় একা একা যেতে বলছেন?

এমিলিয়ার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বিপন্ন বোধ করছে। আমি তাই বললাম—আপনি ঠিকই বলছেন মিঃ বাত্তিসতা। আপনি ওর সঙ্গে যান, আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি।

অগত্যা এমিলিয়া গাড়ীতে উঠে বাত্তিসতার পাশে বসে চঞ্চল ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইলো। ওর চোখের তারায় ফুটে উঠেছিল, অনুনয়, বিরক্তি ও অসহায়তা। আমি ওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ভারী দরজাটা ঠেলে দিলাম।

গাড়ী চলে যাওয়ার পরই মনের তৃপ্তিতে শিস দিতে দিতে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই চৌরাস্তার মাথায় দুর্ঘটনা ঘটলো। আজ প্রাণ ভরে সুখাদ্য খেয়েছি। এছাড়া বাত্তিসতা বলেছেন, একটি চিত্র সম্পাদনার কাজ দেবেন। তাই মনে আনন্দের সীমা ছিল না। দুর্ঘটনার ফলে রাস্তায় দশ পনেরো মিনিট

দেরী হয়ে গেল।

বাত্তিসতার বৈঠকখানায় গিয়ে যখন ঢুকলাম, দেখি এমিলিয়া একটা চেয়ারের ওপর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে। আর বাত্তিসতা একটি চাকাওলা সুরদিমর ওপর পা রেখে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছেন। এমিলিয়া আমার অহেতুক দেরী হওয়ার কারন জানতে চাওয়ায় দুর্ঘটনার কথা সবিস্তারে বললাম। প্রশ্ন করার আগে ঘটনাটা উল্লেখ করা উচিত ছিল ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলাম।

এমিলিয়া আর কিছু বললো না। বাত্তিসতা টেবিলের ওপরে সাজানো তিনটে গ্লাসের মধ্যে থেকে একটা তুলে আমার হাতে দিলেন। গল্প গুজবে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেল। এমিলিয়া যে বেশি কথা বলছে তা না, খুব প্রফুল্ল নয়, সেদিকে আমি খেয়ালই করলাম না। একটিবারও চোখ তুলে বা মুচকি হেসে আমাদের হাসি মস্করায় যোগ দিল না নীরবে সিগারেট টানলো আর মদের গ্লাসে চুমুক দিল, মনে হল ওর সঙ্গে কেউ নেই।

নতুন একটা ছবি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন বাত্তিসতা, বললেন আমি চাই, আপনি এ ছবিতে কাজ করুন।

সমস্ত সংক্ষেপে জানিয়ে বললেন, কাল আমার অফিসে এসে চুক্তিপত্রে সই করে যাবেন।

দুজনেই মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলাম। সেই অবসরে এমিলিয়া বললো, চল, বড় ক্লান্তি লাগছে, বাড়ি চল।

বাত্তিসতাকে অভিবাদন জানিয়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এসে ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সিতে উঠে এমিলিয়ার হাতখানি টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিলাম। কিন্তু ও কোন প্রতিবাদ করলো না।

সে সারাটা রাস্তা চুপ করে বসেছিল।' একটাও কথা বলেনি এমিলিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরেরদিন বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করে চুক্তিপত্রে সই করে অগ্রিম টাকা নিলাম।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—ছবির কাহিনীটি ছিল হাস্য রসাত্মক, সেদিনই চিত্র নির্দেশক ও আমার সহযোগী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হল।

বলতে পারি, বাত্তিসতার বাড়িতেই চিত্র সম্পাদক হিসাবে আমার জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সেদিন থেকেই যে এমিলিয়ার সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটে তা নয়। পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকাশ পায় পরের মাস থেকে। কিন্তু জানি না, ঠিক কোন সময়ে এবং কেন এমিলিয়ার মনের তুলাদণ্ড উল্টে গিয়েছিল।

এরপর বাত্তিসতার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো এবং প্রথম দিনের সন্ধ্যার মত আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাগুলি আমি প্রথমে আমল দিই নি, কিন্তু পরে ঘটনাগুলি বেশ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানে একটি ঘটনার কথা বলছি—

প্রায়ই বাত্তিসতার বাড়ি থেকে আমাদের নিমন্ত্রণ আসতো। এমিলিয়া প্রায়ই সময়ই যেতো চাইতো না। নানারকম অজুহাত দেখাতো, আমি বলতাম, তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও কোনদিন যাইনি, না গেলে বাত্তিসতা রাগ করবেন, তাছাড়া আমাদের অন্নদাতাকেও অপমান করা হবে।

তখন এমিলিয়া আমার যুক্তির কাছে হার মানতো। তারপরে বেরিয়ে পড়তাম দুজনে।

অবশ্য বিক্ষিপ্ত, তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে স্মৃতিমন্থন করে সাজিয়ে নিয়েছিলাম পরে। আগে কেবল জানতাম, আমার সঙ্গে এমিলিয়ার

ব্যবহারে একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তার কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করিনি কখনও। বিয়ের পর আমার সঙ্গ পাওয়ার জন্য সে যেমন ব্যাকুল হত, আজ আর সেই ব্যাকুলতা তার নেই। তখন বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেই ওর চোখ জলে ভরে যেতো, কখনও ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, নয়তো নিজে যেতাম না। কিন্তু এখন তার বিপরীত, আমি বাইরে গেলেই ও যেন শান্তি পায় বেশি।

এমিলিয়া বলতো—আমার অদর্শন তার অসহ্য। গর্বে আমার বুক ভরে যেতো। কিন্তু যখন দেখলাম, আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে আর উৎকণ্ঠিত হয় না, বরং আনন্দ বোধ করে তখন অসহ্য এক যন্ত্রণা অনুভব করতাম, মনে হতো পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

বিকেলে কাজে বেরোনোর কথা। কিন্তু এমিলিয়ার ঔদাসীন্য যাচাই করার জন্য সকালেই বেরিয়ে পড়তাম। বুঝতাম, আমার অনুপস্থিতিতে সে তৃপ্তি ও স্বস্তি পায়। কিন্তু মনে চিন্তা করতাম না এতটুকু, কেবল সান্ত্বনা দিতাম। কারণ, যা সত্য বলেই জানি, তা চিন্তা করে লাভ কি? সে হয়তো মনে করে, আমার উপর তার প্রেম কমে গেছে, হয়তো সে আমায় একেবারেই ভালোবাসে না।

নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে এমিলিয়া তার প্রেমাবেগ হারিয়েছে, অভাবনীয় একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

যখন বাত্তিসতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার শোচনীয় অবস্থা ছিল। তুটি বছর কাটিয়েছি ভাড়া বাড়িতে। এমিলিয়া ছাড়া অন্য কোন স্ত্রী এই সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হতো না। স্বামীর প্রতি নিবিড় প্রেম ছিল তার। সাত্যই এমিলিয়া ছিল স্বভাব-গৃহিনী। তাকে শুধু নারী জাতির স্বভাবজাত প্রবণতা বলা চলে না, এ-অনেকটা ক্ষুধার মত তুর্বার একটা উৎসাহ। তার মূল ছিল এক বংশগত পরি-বেশের মধ্যে।

এমিলিয়ার জন্ম গরীবের ঘরে। সমাজে এমন একদল লোক আছে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে বঞ্চিত, ছোট একটি আশ্রয়-নীড় রচনা

আকাঙ্খা যারা পূরণ করতে পারছে না বংশানুক্রমে। তাদেরই অন্তরের গোপন অপূর্ণ আশা যেন সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছিল এমিলিয়ার সুপ্ত বাসনার মধ্যে। আমার মনে পড়ে, তুজনের বিয়ের কথা যখন পাকা বন্দোবস্ত হল, তখন আমি তাকে জানালাম—আমি তাকে নিজের ঘর দিতে পারবো না। আপাততঃ একটা সজ্জিত কক্ষেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে হবে।

তখন তার তুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—শুধু সাধের স্বপ্ন ভেঙে যাবার হতাশায় নয়, সেই স্বপ্নের আসল রূপ দেখেই অশ্রু নেমেছে তার চোখে। স্বপ্ন তার কাছে অর্থহীন অলীক নয়, সেই স্বপ্নেই যে সে বেঁচে আছে।

প্রথম তুটি বছর একটি সাজানো গোছানো ঘরেই বাস করলাম। ছোট্ট একটি ঘরে সীমাবদ্ধ থেকেও সে মনে করতো, নিজের বাড়িতেই আছে, নিজের হাতে গুছিয়ে রাখতো জিনিষপত্র, শয্যা রচনা করতো। তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও ঘরটি থাকতো ঠিক তেমনি—অপরের তার নিজের নয়। ওর যেন মনের সাধ মিটতো না। মাঝে মাঝে প্রকাশ করতো হতাশা।

আমি বুঝতাম ওর মনের ভাষা। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম—যে ভাবেই হোক, তার সাধ পূর্ণ করতে হবে।

তাই আমি সঙ্গতি না থাকা সত্বেও একটা ফ্ল্যাট লীজ নিলাম। কিন্তু টাকা ধার করে আর পাওয়া কিছু টাকা দিয়ে প্রথম কিস্তি শোধ করলাম। আমি কিন্তু প্রিয়তমার জন্য গৃহ রচনা করে তৃপ্তি পেলাম না। কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা শোধ করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে হয়ে উঠলাম। এমিলিয়ার জন্যই এই অবস্থা। তাই ওর ওপর বিতৃষ্ণা এলো।

যাইহোক, যেদিন নতুন ফ্ল্যাটে গেলাম সেদিন এমিলিয়ার আনন্দের উচ্ছাস দেখে আমি নিজের চিন্তায় কয়েকদিন ভুলে রইলাম।

মনে হলো, এই ফ্ল্যাটটি যোগ্যার করে—আমি এমিলিয়ার চোখে হয়ে

উঠেছি প্রিয়তর। দেহের দিক থেকে আরও কাছে এসেছে, আরও অন্তরঙ্গ হয়েছি তার।

ত্বজনে মিলে ফ্ল্যাটটি দেখতে এলাম। চারিদিক ঘুরে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরগুলি দেখতে লাগলাম।

ঘর দেখা শেষ করে জানলা খুলে বাইরের দৃশ্য দেখবো বলে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো এমিলিয়া, নীচু স্বরে বললো, একটা চুমো খাও না। আমি তার এই অপ্রত্যাশিত অভিনব আচরণে ও কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত হয়ে চুম্বন করলাম তাকে। সে আমায় নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করলো, সেমিজ ও বডিসের বোতাম খুলে তার পেটটি আমার পেটের ওপর রাখলো।

মাটিতে ধুলোমাখা বালির স্তূপের উপর জানলার নীচে চললো আমাদের প্রেম-লীলা।

বুঝলাম—তার আকস্মিক কামাবেগের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থাপনের মনের সুপ্ত বাসনা ফাঁকা ঘরগুলির রঙ ও চুন বালির গন্ধে তার দেহে রোমাঞ্চ জেগেছিল, পুলক প্রবাহ ছুটেছিল অন্তরের মনি কুঠুরীতে। আগের সোহাগ-প্রেমে তার দেহ-মনে এমন উত্তেজনা জাগানো অসম্ভব।

নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর ত্বমাস কেটে গেছে। সীমাবদ্ধ আয় থেকেই ত্ব একটা আসবাব কিনেছি। এমন কি কিছু সঞ্চয় করতে পারি ইচ্ছে করলেই। কিন্তু সেই সামান্য সঞ্চয় থেকে ফ্ল্যাটের কিস্তির টাকা দেওয়া সম্ভব না। এমিলিয়াকে আমি কিছুই জানাই নি। আমি তো তার মন থেকে আনন্দটুকু কেড়ে নিতে পারি না। এমিলিয়া জানে আমার অবস্থার কথা। কিন্তু তাতে তার মাথাব্যথা নেই। আমার মনের অশান্তি ও উদ্বেগের দিকে কোন খেয়ালই নেই তার। সে নির্লিপ্ত, নির্বিকার। এ তো তার স্বার্থপরতা, হয়তো অবিবেচনা।

মনেব পটে নিজের যে মূর্তিটি এঁকেছিলাম তার রূপ পাল্টে গেল।

ভাবতাম, আমি একজন সংস্কৃতিবান, রুচিশীল, বিচক্ষণ, বিদ্বান তরুন। কিন্তু তার পরিবর্তে সেদিন সেই নির্মম চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় দেখলাম, এক নিঃস্ব শয়তান ফাঁদে পড়েছে। পত্নী-প্রেম উপেক্ষা করতে না পেরে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

দৈহিক রূপান্তরও ঘটলো—আমি আর তরুণ, অখ্যাত প্রতিভাবান নাট্যকার নই—একজন দরিদ্র সাংবাদিক—যে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্থের সন্ধানে শহরের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়—দেনার দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমোতে পারেনা, অর্থচিন্তা ছাড়া তার কোন চিন্তা নেই তার মনে।

তবে একজন হতভাগ্য সাহিত্যিকের জীবনেব করুণ, মলিন, বিবর্ণ চিত্র।

ঘৃণায় মন ভরে উঠলো। ক্রমে ক্রমে আমার সবই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার পত্নী সুন্দরী অশিক্ষিতা টাইপিষ্ট। তার মধ্যে হয়তো রয়েছে তার শ্রেণীগত সংস্কার ও উচ্চাভিলাষ। সে যদি আমায় ঠিক বুঝতে পারতো তাহলে নাট্যকার হিসাবে সাফল্যের আশায় দীন ভাবে কোন ষ্টুডিওতে কিংবা সুসজ্জিত কক্ষে বিশৃঙ্খল কষ্টকর জীবন-যাপনের বেদনা অম্লান বদনে বরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী তা চায় না। হতাশায় মন ভরে গেল। ক্রমে বেড়ে গেল মনের বেদনা ও অসহায়তার মাত্রা। যারা ধনী ও বিশেষ অধিকারভোগী, যারা এমন দুঃখ ভোগ করে না, তাদের ওপর আমার হিংসে হলো। দারিদ্রের প্রতি আমার বিদ্বেষ সকলের উপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করলো।

আমার মনের চিন্তা একই পথ অনুসরণ করছিল বরাবর, লক্ষ্য ছিল কেবল একটি। তাই আমার অন্তরের ঘৃনা, কল্পনা ও মনের এই অদৃশ্য রূপান্তর সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সচেতন। হয়তো, আমার দুঃখ কষ্টের জন্য সমাজ দায়ী। এই সমাজ তার যোগ্যতম সন্তানদের খোঁড়া করে রেখেছে। অযোগ্যদের পোষণ করছে। কিন্তু নিজের

ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম আমি, পরীক্ষা করছিলাম নিজেকে। আমি যেন অপর লোককে দেখছি--নিজেকে নয়। তবু জানতাম নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করছি। আমার মধ্যেই ছিল পৃথক সত্বা। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এ কী? আমার চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও আচরণ ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যেন।

আমাব এক বন্ধু এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে বিশ্বাস জাগালো আমার মনে। আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হলাম।

এসংবাদ শুনে এমিলিয়া বলেছিল, এখন শুধু কম্যুনিষ্টরাই তোমায় কাজ দেবে, আর সবাই বয়কট করবে। তাকে জানাবার ইচ্ছা হলো, তোমায় খুশী করবার জন্য ফ্ল্যাটটি না নিলে 'কম্যুনিষ্ট' হতে হতো না।

কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে না পারার দরুন ব্যাপারটা ঐখানেই ইতি হল।

আমরা নতুন বাড়িতে গেলাম। বাত্তিসতা আমার একটি চিত্র সম্পাদনার কাজে ডাক দিলেন। বহুদিন পরে মনে শান্তি ফিরে পেলাম। ভাবলাম, চার পাঁচটি চিত্রনাট্য লিখে ধার শোধ করবো। এই সময়ে এমিলিয়ার ওপর আমার প্রেম আরো গভীর হয়ে উঠলো। তাকে স্বার্থপর, অবিবেচক ও নিলর্জ ভেবেছিলাম। মনে মনে দুঃখ অনুভব করলাম. নিজেই নিজেকে তিরস্কার করলাম।

কিন্তু সুখ বেশিদিন কপালে রইলো না। মনের ভাগ্যাকাশে জমলো এক টুকরো ঘন কালো মেঘ।

তৃতীয় অধ্যায়

বাত্তিসতার সঙ্গে আমার দেখা হয় অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারে। অপরিসর রাস্তার উপর তৈরী নতুন বাড়ির দোতলায় আমাদের ফ্ল্যাটটি, বেশ জমকালো নয়। ছোট ছোট তিনখানি ঘর বাথরুম, রান্নাঘর সব রয়েছে। বাড়ীর বাইরে একটি ছায়া ঘন বাগানবাড়ি, সামনে রাস্তা নেই, বাড়ির সংলগ্ন কোন প্রাচীর নেই, ইচ্ছেমত যখন খুশী বাগানে বেরিয়ে আসতে পারি।

বিকেলবেলা আমরা এসেছিলাম। সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গিয়েছিল। মনে পড়ে, শোবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেকটাই খুলছি। হঠাৎ আয়নার ভেতর দিয়ে দেখলাম, এমিলিয়া একটা বালিকা নিয়ে পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

আমি জানতে চাইলে বললো, আচ্ছা, আমি যদি রোজ ওঘরে ঘুমোই, তাহলে কি তোমার কোন আপত্তি আছে। আমি তোমার মত জানলার খড়খড়ি খুলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি না। আমার মনে হয়, দুজনের আলাদা থাকাই ভালো।

বুঝতে পারলাম না তার ইঙ্গিত। এ আবার কী কথা? সামনে এসে বললাম, না, তা হতে পারে না—পারে না—আলাদা শোবে কেন? বিছানায় না শুয়ে গদির উপর শোওয়া আরামের নয় নিশ্চয়। আর, তোমার অসুবিধার কথা আর তো কখনও বলনি আমায়।

চোখ দুটি নামিয়ে বললো, সাহস হয়নি।

বললাম, দুবছরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও তো বলতে পারতে। আমি ভেবেছিলাম, তোমারও অভ্যাস হয়ে গেছে।

সে যেন খুশী হলো। কোন কথা না বলেই ঘর থেকে যাবার জন্য পা বাড়ালো। বললাম, দাঁড়াও, আচ্ছা বেশ—এবার থেকে খড়খড়ি

বন্ধ করেই ঘুমুবো। তাহলে হবে তো? তোমার জন্য ওটুকু ত্যাগ স্বীকারই করলাম না হয়।

কিন্তু এমিলিয়া নাচার। সে কোনই প্রস্তাবেই রাজী হল না।

অগত্যা বিছানার ওপর বসে পড়লাম। একটা বালিকা উধাও হয়েছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে—তুজনের ছাড়াছাড়ি হয়েছে, আমি একা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। বিস্মিত বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম—এমিলিয়া যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সেদিকে।

মনে মনে প্রশ্ন জাগলো—দিনের আলোয় ঘুম ভেঙে যায় বলেই কি এমিলিয়া আমার সঙ্গে এক শয্যায় শুতে চায় না, না কি আমার সঙ্গে থাকতেই চায় না আর?

মনে হয়, দ্বিতীয় কারণটাই ঠিক। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম—প্রথমটাই সত্য হোক। সত্যিই কি তবে এমিলিয়া ভালবাসে না আমায়? চিন্তার সমুদ্রে ডুবে আছি।

এমিলিয়া হয়তো লম্বা ছিল না, কিন্তু তাকে আর সব মেয়ের চাইতে লম্বা ও বড়-সড় মনে হতো আমার। পরিণয় রাত্রিতে আলিঙ্গন করেছিলাম তাকে। সে খালি গায়ে ছিল। দেখেছিলাম—তার কপালটি আমার বুকের উপরে ঠেকেছে—তুটি সুন্দর কাঁধ ও মাথাটির মাপে আমি তার চেয়ে লম্বা, তার বাহু তুটি সুদৃশ্য। গোলগাল, গায়ের রঙ ময়লা, নাকটি বেশ ধারাল ও স্পষ্ট, হাসি খুশি মুখটি, কামনা ভরা তুটি চোখ। নিখুঁত ছিল না দেহের গড়ন। তবু আমার কাছে সে ছিল অনন্যা। সত্যিই তার মধ্যে ছিল এক অপূর্ব কমনীয়তা, রহস্যময় বর্ণণাতীত সহজাত গাম্ভীর্য।

চেয়ে আছি তার দিকে। ভেবে পাচ্ছি না—কি করবো। পাতলা সেমিজের ভেতর দিয়ে তার দেহের বর্ণ ও বুকের গঠনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়লো, সে যখন আমায় আর ভালোবাসে না তখন তার সঙ্গে দৈহিক মিলন সম্ভব নয়। প্রেম তো শুধু একটি মানসিক বৃত্তি নয়, অনবদ্য ও স্বাভাবিক দৈহিক মিলনও

বটে। এতদিন এমিলিয়ার মন না জেনেই তাকে ভোগ করেছি। এখন যেন এই সুস্পষ্ট অথচ গোপন সত্য চোখের সামনে আরো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো। আমাদের মিলন অব্যাহত থাকবে না—নেইও—

অকারণে ছিঁড়ে গেছে প্রেমের বাঁধন, বিচ্ছেদ ও বিরহ ঘিরে আসছে জীবনের চারদিক থেকে। তীব্র ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও বেদনায় অন্তর ভরে উঠলো।

এমিলিয়াকে আমার সামনে দিয়ে যেতে দেখে তার হাতখানা সজোরে চেপে ধরলাম। বললাম, এসো—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার নিস্ফল চেষ্টাই করলো সে। অদূরে বিছানার উপরে বসলো, আমার সঙ্গে কথা আছে, কি কথা?

এরকম মনের ভাব আগে আমাদের মধ্যে ছিল না। তাই আসন্ন পরিবর্তনকে লজ্জা স্পষ্টতর নিশ্চিততর করে তুললো।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কথা আছে, মনে হচ্ছে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে তুজনের মধ্যে।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বেশ সরল ভাবেই বললো—কি যে তুমি বলো, কি পরিবর্তন হয়েছে? তুজনেই তো ঠিকই আছি।

পরিবর্তন হয়েছে তোমার।

মোটেও না, আমি ঠিক একই আছি।

ও কী? আমার যুক্তি ও বিদ্বেষ যেন আগুনের শিখায় মোমের মত গলে যাচ্ছে। এমিলিয়ার গায়ের পাতলা সেমিজের তলায় স্পষ্ট চোখে পড়ছে তার দেহের সুপরিচিত গোপন বর্ণ ও আকার। কামনা মনে জেগে উঠলো, উত্তেজনায় ভরে গেল সারা শরীর।

কিন্তু কেবল আমার মনের কামনাই তারদিকে টেনে নিয়ে যাবে কেন? আমার মত তারও কামনা জেগে উঠবে না কেন? কেন?

আমি চাপা স্বরে শুনলাম, ঠিক আছে তার প্রমাণ দাও। এই মুহূর্তেই আমি প্রমাণ চাই।

আমি ঝুকে পড়লাম তার দিকে। দুর্বার বিক্রমে তার চুল ধরে মাথাটি নামিয়ে চুমো খেতে চাইলাম।

কিন্তু প্রথমে সে আপত্তি করলো না। পরে সে তার মাথাটা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। বললাম—তুমি কি চাও না, আমি তোমায় চুমু খাই?

না, একটা চুমু হলে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার পরেও তুমি ছাড়বে না—আর—আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

তার কোন কথা শুনলাম না। আবার জড়িয়ে ধরলাম। সে বললো —উঃ, লাগছে।

আশ্চর্য! এর আগে আমি কত জোরে চেপে ধরতাম, আর এখন হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই লাগছে। রাগ হলো তাই। আগে তো তোমার লাগতো না এতে।

'তুমি জান না—লোহার মত শক্ত তোমার হাত—

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, তা বলে চুমু খেতে দেবে না?

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার ভুরুর উপর একটি চুমু খেলো সে। বলল, এবার ঘুমোই গিয়ে, কেমন? আজ রাত হয়েছে অনেক।

আমি তবুও নিরস্ত হলাম না। ওর নিতম্বের নিচে হাত রেখে বললাম, এমন চুমু তো তোমার কাছে চাইনি এমিলিয়া।

আমি আবার জড়িয়ে ধরতেই সে আমাকে হাত দিয়ে ঠেলে দিল। কর্কশ কণ্ঠে বলল, আঃ, ছাড় না—লাগছে।

তার গায়ের ওপর সামান্য ভর দিয়ে বললাম, না না না, লক্ষ্মীটি, তোমার একথা সত্যি নয়।

সে সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, কী করবে করে নাও তাড়াতাড়ি, ওরকম চেপে ধরলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ওর কণ্ঠস্বরে এতটুকু আবেগের চিহ্ন নেই।

হাতের ওপর হাত রেখে মাথাটা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলাম।

খানিক পরেই এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো, "এসো, যখন কিছুতেই ছাড়বে না, কি বল ?

আমি মাথা না তুলেই বললাম, নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমার মনে তখন কামনা ভোগ করার বাসনা ছিল না। তখন আমি নতুন বিচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত সহ্য করবার প্রাণপন চেষ্টা করলাম।

ঘরের ভেতর সে একবার ঘুরপাক খেয়ে সেমিজ খুলতে লাগলো। আমার মনে পড়ে গেল, আগেকার দিনগুলোর কথা। ওর এই সেমিজ খোলার দৃশ্যটি আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতাম। কিন্তু আজ মনে তেমন ইচ্ছা নেই, কৌতুহলও নেই। কারণ এমিলিয়া আজ উদাসীন, উভয়ে উভয়ের উপর নির্মম হয়েছি, দুজনেই হয়েছি, দুজনের অযোগ্য।

কোলের ওপর হাত দুটো জড় করে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। বেডকভারটি না তুলেই এমিলিয়া বিছানায় শুয়ে পডলো।

আমায় ডাকল, এসো না, দেরী করছ কেন ?

আমি স্থানুর মত বসে রইলাম, এক তিলও নড়লাম না। এই কি আমাদের স্বাভাবিক জীবন ? এমনি করেই এমিলিয়া ডাকতো। কিন্তু তবুও এ ডাকের মধ্যে আর সে ডাকের মধ্যে তফাৎ রয়ে গেছে। আগে সব কিছু নিমেষের মধ্যে ঘটে যেত। বুঝতেই পারতাম না, কখন এমিলিয়ার বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে গেছি। আজ এমিলিয়া সেই আকুলতা ও বিশিষ্টতা নেই, আমারও নেই। কিন্তু আমি যেন আজ আমার প্রেয়সীর মুখোমুখি বসে নেই, বসে আছি কোন রূপে ভোলানো পসারিণীর সামনে।

মুহূর্তের জন্যে এমিলিয়াকে দেখলাম। ঠিক যেন একটি অপচ্ছায়া। বিছানায় শোয়া এমিলিয়ার সঙ্গে ছায়ামূর্তিটি মিলে মিশে যেন এক হয়ে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, কিছু মনে করো না এমিলিয়া, আজ থাক, আমি বরং ও ঘরে গিয়ে ঘুমুচ্ছি। তুমি এখানে

থাক।
পায়ে পায়ে পাশের ঘরে চলে গেলাম। একবার তার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। এমিলিয়া একই ভাবে শুয়ে আছে। একটা হাত মাথার নীচে, অন্য হাতটা বুকের ওপর রয়েছে, খোলা চোখ দুটির দৃষ্টি শূন্যে, মাথাটি আমার দিকে রয়েছে।
আমার এবার মনে হলো, না না, এ রূপ পসারিণী নয়, এ হল আলেয়া। তার চারদিকে ঘন কুয়াশার আচ্ছাদন। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। বাস্তব সীমানার বাইরে, আমার অনুভূতির ধরা ছোঁয়ার ওপারে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রমশঃ মনে হল দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এমিলিয়ার ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। সে যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। জোর করে তার কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় না করাই উচিত। কিন্তু তবুও ভালোবাসতে লাগলাম।
প্রেমের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কারণটা আমি জানি না— পরের দিন রাত্রির ঘটনার গুরুত্ব কমে গেল আমার কাছে। মনে হল ওটা একটা মনের ভুল। ইচ্ছে করলেই সব ভোলা যায়। এমিলিয়া একা থাকতে চাইতো ঠিকই কিন্তু দেহ দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো না। তাই বিদ্রোহী মন ক'দিনের মধ্যে সয়ে গেল, এমন কি তৃপ্তিকর মনে হলো। ভয় করছিলাম—সে বুঝি আমাকে আর চায় না। তবু, তার উদাসীন্য ও নিস্ক্রিয়তার জন্য কৃতজ্ঞ হলাম তার কাছে।
থিয়েটারের কাজ ছেড়ে সিনেমার কাজ ধরেছি, একমাত্র এমিলিয়ার

মনের সাধ পূরণ করার জন্য। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পর আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, মন অশান্ত হয়ে উঠেছে, কাজে বিরক্ত এসে জমেছে। এখন এ কাজ করার কোন অর্থই হয় না। এখন সে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেছে। এ শুধু মিথ্যে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার মনের অবস্থা আরও স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে এক্ষেত্রে চিত্র সম্পাদকের কাজ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা প্রয়োজন।

নাটক, দৃশ্য ও চিত্রগ্রহণ, নির্দেশনা ও পরিচালনা, সব এক সঙ্গে নিয়ে চিত্রনাট্য। চিত্রসম্পাদকের স্থান পরিচালকের পরেই এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যবনিকা অন্তরালে তার জায়গা, অথচ চিত্রের সাফল্যের জন্য সে বুকের রক্ত নিঃশেষ করে দিচ্ছে। কখনও সে নিজের নাম জাহির করতে পারে না। চিত্র সম্পাদকের জীবন হলো—খাটুনির পরিবর্তে যা পায় তা দিয়ে সম্ভব হলে আনন্দ স্ফূর্তি করো, অবিশ্রান্ত অবিরাম। নার্স যেমন একটি শিশুকে ছেড়ে তার একটি শিশু পালনের দায়িত্ব নেয়, আর তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করেন শিশুর জননী, এও ঠিক তাই। চিত্র সম্পাদকের জীবনে কতগুলি বিরক্তিকর অসুবিধাও আছে। চিত্র সম্পাদকের স্বাধীন সত্তা নেই, স্বাস্থ্য ও রুচির অনুকূল পরিবেশ নেই। তবে সবসময় যে অনুকূল পরিবেশে থাকে তা নয়। তবে ভালো ছবি যেমন বিরল, তেমনি সত্যিকারের সুস্থ পরিবেশও দেখা যায় খুব কম।

এবার অন্য একজন চিত্রনাট্যের সম্পাদনার চুক্তি পত্রে সই করলাম।

আমি আমার দৃঢ় সংকল্প ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম।

মনটা ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠলো। সংগ্রামী হয়ে উঠলো, একটানা পরিচালক ও চিত্র সম্পাদকের সুদীর্ঘ আলোচনা ও সহযোগীদের মতামত শুনতে ভালো লাগতো না। মনে হতো, নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছি। তবু, তাতেই নষ্ট করেছি আমার সবচেয়ে মূল্যবান

বস্তুটি। অপচয় করেছি আমার প্রতিভার। কিন্তু এত বিরক্ত থাকা সত্বেও কখনও কর্তব্যে অগ্রাহ্য করে নি।

চিত্র নাট্যকলা হচ্ছে আট চাকার ঘোড়ার গাড়ি একটি। তার মধ্যে কর্মঠ ও শক্তিশালী ঘোড়াগুলিই গাড়ি টানে, বাকি ঘোড়াগুলিকে টানে তাদের সাথীরাই—যারা একসঙ্গে টানে ঘোড়া ও গাড়ি দুটোই। মনের অধীরতা ও বিষণ্ণতা সত্বেও আমি ঐ গাড়ি টানা ঘোড়ার মধ্যে ছিলাম। পরিচালক ও সহযোগীরা অসুবিধা দেখলেই আমার অপেক্ষায় থাকতেন, সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছেই দৌড়ে আসতেন। নিজের বিচার শক্তিকে মনে মনে অভিসম্পাত করতাম, তবু বিনা সঙ্কোচে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হাসিল করে দিতাম।

সততা ও সদ্বুদ্ধি বজায় রাখার জন্য করতাম, নিজের বুদ্ধি জাহির করবার জন্য নয়। চুক্তিপত্র সই করার দুমাস পরে অসুবিধাগুলোর কথা জানতে পারলাম। প্রথমে আমার বুঝতে দেরী হয়েছিল—এসব অসুবিধা আগে চোখে পড়েনি কেন, কেন সেগুলো আবিস্কার করতে অনেক দিন লাগলো ?

যতদিন এমিলিয়ার প্রেমের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন মনের সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছি। এখন এমিলিয়া আমায় আর ভালোবাসে না। বিশ্বাস ও মনের বলও হারিয়ে ফেলেছি। কেবলই মনে হয়, এ শুধু দাসত্ব, প্রতিভার অব্যবহার, সময়ের অপচয়।

পঞ্চম অধ্যায়

দিন ক্রমশঃ কাটতে লাগলো।

আমি যেন কি এক কঠিন রোগের অসহ্য ভার বয়ে বেড়াচ্ছি, অথচ ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সাহস হল না। মনের আকাশে সন্দেহের মেঘ জমতে দেখে মনে মনে ভীত হলাম। এমিলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে বাস করা অসম্ভব, তবু একসঙ্গে দিন কাটাতে লাগলাম। মনকে নিষ্পাপ সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, দিনের বেলায় অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ও অসংলগ্ন আলাপ, রাত্রিতে কখনও কখনও প্রেমলীলা—যাকে বলা যায় কতকটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা এমিলিয়ার উপর অত্যাচার এই তো স্বাভাবিক আমাদের জীবনে।

যতই কাজ করি না কেন দিনে দিনে অনিচ্ছা ও বিরক্তি এসে চেপে ধরলো। এমিলিয়া সবসময় এড়িয়ে চলে। মন দিয়ে কাজ করতে পারি না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠি মাঝে মাঝে। মনে দুশ্চিন্তা জেগে ওঠে।

এর মধ্যে বাত্তিসতার চিত্র-নাট্য সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েছে। আমায় আর একটা কাজের কথা বললেন। জানালেন, এবার প্রথম চিত্র নাট্যটির চেয়ে বেশি টাকা পাবেন আপনি।

চিত্র-সম্পাদনার ওপর আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবু বাত্তি-সতার প্রস্তাবে রাজী হলাম, কারণ প্রথমেই মনে পড়লো সেই ফ্ল্যাটটির কথা।

এমিলিয়াকে দুটি কারণের জন্য বাত্তিসতার নতুন প্রস্তাবটির কথা জানালাম না। এক নম্বর, প্রস্তাবটি গ্রহণ করবো কি না জানি না। দু নম্বর হচ্ছে, জানতে পেরেছি, আমার কাজে কোন কৌতুহল নেই এমিলিয়ার। কিন্তু এমিলিয়ার ভালবাসা বা উপেক্ষার ওপর

কাজটি নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করছে। এমিলিয়া আমায় আর ভালোবাসে না। তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কাজটা নেবো কি নেবো না। এমিলিয়া যদি আগের মত ভালোবাসতো, তাহলে তাকে ব্যাপারটা জানাতাম এবং কাজটিও নেওয়া হতো।

বাত্তিসতার জন্য যে চিত্রনাট্যটা লিখেছিলাম, তারই চিত্রপরিচালকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। আজই শেষ —আর দুটি পৃষ্ঠা মাত্র বাকি। মনে তৃপ্তি অনুভব করলাম। শীগগিরই মনে হয় আর একটি বিরক্তিপূর্ণ কাহিনী এসে পড়বে। আপাততঃ একটির হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি।

আসন্ন মুক্তির আশঙ্কায় মন আনন্দে ভরে উঠলো। পাণ্ডুলিপির কয়েক জায়গা অদল বদল করতে হল। মাত্র দুঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারলাম—চিত্রনাট্য—সম্পাদনা শেষ হয়েছে।

পর্বত ভ্রমণকারী যেমন তার হারানো পথ খুঁজে পায় তেমনি একটি সংলাপ রচনা করে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলাম—কেন, এখানেই তো শেষ করা যেতে পারে।

আমি একমনে লিখে যাচ্ছিলাম। পরিচালক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি উঁকি মেরে দেখে বললেন, ঠিক—ঠিক বলেছেন, সত্যিই তো, এখানে শেষ করা যায়।

তাই পাণ্ডুলিপির শেষ পাতায় সমাপ্ত লিখে কাজ করলাম।

দুজনে অনেকক্ষণ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম, দুজনের নজর ডেস্ক-এর উপর নিবদ্ধ—যেন দুজন অবসন্ন পর্বতারোহী অতিকষ্টে একটি অপরিসর হ্রদে বা চূড়ায় এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে পরম তৃপ্তি ভরে চেয়ে আছে।

অবশেষে পরিচালক বললেন, কাজ শেষ হল তাহলে, মুখে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললেন, কাঁচা পয়সার বশবর্তী হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষে করতে পারলেন—না ?

তরুন সুদর্শন চেহারার পরিচালক মিঃ পাসেত্তির। বয়েসে প্রায়

আমারই সমবয়েসী। কিন্তু তিনি পরিচালক আর আমি চিত্রনাট্য সম্পাদক, দুজনের মধ্যে মনিব ও চাকরের মতো সম্পর্ক।
আমার সঙ্গে তাঁর জীবন ও চরিত্রের কোন সাদৃশ্য ছিল না। কল্পনা শক্তি ও সাহস না থাকলেও ভদ্রলোককে মোটামুটি শিষ্টাচারী বলা চলে।
তাঁর রসিকতায় গম্ভীরভাবে বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন?
তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মনে করবেন আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাই আপনার প্রাপ্য সবটা না দিয়ে কিছু হাতে রেখে দেবো—বুঝলেন তো?
পরিচালকের কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর লক্ষ্য করলাম। তাঁর মত তরুণের মুখে এ কথা অচিন্ত্যনীয়। তিনি তাঁর সহযোগীদের অনেকের মধ্যে প্রশংসাও করছেন আবার দোষারোপ করতেও ছাড়ছেন না। কখনও তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে তোষামোদ, আবার আবেগের সুরে অনুরোধও তাল মেশায়। কাজ করিয়ে নেবার পটুতার উপরই পরিচালকের কৃতিত্ব নির্ভর করে। এদিক থেকে তাঁকে একজন অভিজ্ঞ চিত্র পরিচালক বলা যায়।
আমি বলে উঠলাম, না, আমার সব টাকাটা দিতে বলবেন, আপনাকে কথা দিচ্ছি, যখনই দরকার হবে ডাকলেই আমি এসে কাজ করে দিয়ে যাবো।
উনি ঠাট্টা করে বললেন, এত টাকা দিয়ে আপনি কি করেন মশাই? আপনার কোন দেনা নেই, উপপত্নী নেই, এমন কি ছেলেপিলেও নেই—
আমি তাঁর কথায় একটু মুষড়ে পড়লাম। বললাম, ফ্ল্যাটের কিস্তি দিতে হয়।
অনেক টাকা বাকী রয়েছে বুঝি?
প্রায় সব টাকাই বাকি।
তবু, আমি বাজী রেখে বলতে পারি, পাওনা টাকা আদায় করতে না

প্যারলে আপনার স্ত্রী আপনাকে ধমকান—আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠস্বর—তিনি আপনাকে বলছেন, দেখ রিকার্ডো, ওদের কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে এসো কিন্তু—কি তাই না ?

আমাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো। বললাম, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী–কিন্তু আপনি তো জানেন–মেয়েদের স্বভাব–ঘর তাদের কাছে অতি মূল্যবান।

আমায় ও কথা বলছেন আপনি।

এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীর গুণগান করতে লাগলেন।

পাসেত্তির যোগ্য স্ত্রী তিনি। পাসেত্তি মনে করেন—তিনি একটি চঞ্চল জীব···

পরিচালকের কথা আমার কানে একটাও পৌঁছলো না। মন চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। মুখ চোখের এমন ভঙ্গি করলাম, যেন কত মনযোগ দিয়ে শুনছি তাঁর কথা। হঠাৎ তিনি তাঁর গল্প শেষ করলেন কিন্তু আমি জানি, আপনারা অর্থাৎ চিত্র সম্পাদকরা টাকাটা হাতে পেলেই, ব্যস, আর তার নাগাল পাওয়া যায় না, না না, বাত্তিসতাকে বলতে হবে, আপনার একটা কিস্তির টাকা যেন আটকে রাখে।

দেখুন, আমি যা বলেছি দয়া করে তাই করবেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে, তবে একেবারে ঐ আশায় বসে থাকবেন না।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমি তাঁর উত্তর শুনে খুশী হয়ে বললাম—কাজটি শেষ হয়েছে। যাবার সময় হয়েছে আমার।

নিশ্চিন্ত মনে আনন্দের সঙ্গে বললেন, সে কি, আসুন, আমাদের আগামী চিত্রের সাফল্যের জন্য পানাহার করা যাক—চিত্রনাট্য শেষ করার পর আপনাকে তো আর এমনি চলে যেতে দিতে পারি না—আমার বাড়ি যেতে কি আপনার আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি কিসের ?

বেশ, তবে আসুন, আমার স্ত্রী এ আনন্দে যোগ দিতে পারলে আনন্দ পাবে।

একটা সরু পথ ধরে পাসেত্তির পেছু পেছু চললাম। পাসেত্তি ঘরে ঢুকে ডাকলেন, লুইস! মলটেনি ও আমি আমাদের চিত্রনাট্য সমাপ্ত করেছি। এখন আমাদের ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করো।

মিসেস পাসেত্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। ভদ্রমহিলা দেখতে বেঁটে, ফ্যাকাসে মুখের ওপর নেমে এসেছে কালো চুল। স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর ডাগর চোখ তুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই স্বামী চলে গেলে গেলে কোন দিকে তাকান, বিয়ের চার বছরের মধ্যে চারটি সন্তানের মা হয়েছেন।

অগ্নি কুণ্ডের অপরদিকে চেয়ারে বসেছিলাম আমি। আমি চুপ করে বসে ঘরটির চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় করবার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না মিসেস পাসেত্তি। একভাবে ঘাড় নীচু করে কোলের ওপর হাত রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

পাসেত্তি তুবোতল মদ এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। আবার বরফ আনার জন্য বাইরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, মিসেস পাসেত্তি, জানেন, আমাদের চিত্রনাট্যটি শেষ হয়েছে?

মিসেস পাসেত্তি একইভাবে বসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ জিনোর মুখে শুনেছি—

আচ্ছা, গল্পটি আপনি জানেন নিশ্চয়ই? আপনার কেমন লেগেছে?

হ্যাঁ, শুনেছি। জিনোর যখন ভালো লেগেছে তখন আমার ভালো না লেগে পারে?

সব সময় আপনারা তুজনেই বুঝি একমত হন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, জিনো ও আমি।

তবু, কার মত বেশী শক্তিশালী।

কেন? জিনোর।

আমি সারাক্ষণ কথার মধ্যে কেবল লক্ষ্য করে গেলাম, ভদ্রমহিলার মুখে জিনোর ছাড়া আর কোন কথা নেই।

পাসেত্তি বরফ নিয়ে ফিরে এসেই বললেন, রিকার্ডো, আপনার স্ত্রী আপনাকে টেলিফোন করছেন।

মনে করলাম আমার সুখের দিন ফিরে এলো বুঝি। তাই ব্যস্তপায়ে উঠে দাঁড়ালাম।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটি বাক্সের উপর ছিল টেলিফোনটি। রিসিভার তুলে নিলাম। ওপার থেকে এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আমি মার কাছে যাচ্ছি, বুঝলে, তুমি বাইরে খেয়ে এসো। তোমার কাছে বাধা হবে বলে আগে কিছু জানাই নি।

ঠিক আছে, আমি রেস্তোরায় খেয়ে নেবো।

ভেবেছিলাম, চিত্রনাট্যটি শেষ হবার পর খবরটা দেবো এমিলিয়াকে। তাই একা রেস্তোরায় খাওয়ার কথা ভাবতেই নিরাশ হয়ে পড়লাম। হয়তো অবশেষে তাকে জানাতাম না। কারণ এ বিষয়ে তার তেমন উৎসাহ নেই। তবু, দুজনের পুরোনো সম্পর্কের কথা যে ভুলতে পারি নি।

পাসেত্তি জানালো, কেন আর রেস্তোরাঁয় খেতে যাবেন। বরং এখানে আমাদের সাথে সাধারণ খাওয়া খেলেই আমরা দুজনেই আনন্দ পাব। তাই পাসেত্তির নিমন্ত্রণে খুশি হলাম। কেবল রাজীই হলাম না, কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

বোতল দুটোর মুখ খুলে পাসেত্তি, জিন ও সুরা মিশিয়ে গ্লাসে ঢালতে লাগলেন। অপলক চোখে মিসেস পাসেত্তি তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে।

ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, শুধু একফোঁটা—এত দিও না, আর তুমি—তুমিও বেশি খেয়ো না জিনো শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

পাসেত্তি হেসে বললেন, কি যে বল তুমি! রোজই তো আর

চিত্রনাট্য শেষ হয় না।

পাসেত্তি একটা গ্লাসে অল্প দিলেন আর বাকী দুটো গ্লাস ভর্তি করে দিলেন, যে যার গ্লাস হাতে তুলে নিলাম।

একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে মিসেস পাসেত্তি বললেন, এবার রান্নাঘরের দিকে যেতে হবে, দেখি ঝিটা কি করছে—কিছু মনে করবেন না।

মিসেস পাসেত্তি অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেলেন। পাসেত্তি চেয়ারে বসে চিত্র-নাট্য সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন, আর মাঝে মধ্যে সায় দিতে লাগলাম। মনের দুঃখ ভোলার জন্য তিনচার গেলাস মদ খেয়েছি। কিন্তু নেশা হয়নি, দুঃখ আরো বাড়ছে। মনে পড়ে গেল একটু আগে ফোনে শোনা এমিলিয়ার উদাস ও যুক্তিপূর্ণ গলার স্বর। মিসেস পাসেত্তির সঙ্গে কত পার্থক্য তার। আমার চিন্তা শক্তি লোপ পেল।

কিছুক্ষণ পরেই মিসেস পাসেত্তি খেতে ডাকলেন।

পরিস্কার পরিপাটি ঘরে বসে নীরবে খেতে লাগলাম। আমি পাসেত্তির সেই একঘেয়ে কথা শুনতে লাগলাম। আমার দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ মিসেস পাসেত্তির ওপর নজর পড়তেই দেখি, তিনি গালে হাত দিয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছেন এবং একভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি তার রহস্যময় আবেগ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। নারীর মন হরণ করার মত কোন গুণই নেই পাসেত্তির। মনে মনে বললাম—পুরুষ মাত্রই সন্ধান করে নেয় এমন নারী, যে তাকে ভালবাসে ও তার গুণাবধারণ করে। নিজের মন দিয়ে তো অপরের মন যাচাই করা যায় না। পতিভক্তির জন্য মিসেস পাসেত্তির ওপর আমার সহানুভূতি জাগলো।

হয়তো মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলাম, ঐ নারীর দুটি চোখে ফুটে উঠেছে—স্বামীর প্রতি অকপট প্রেম, তাঁর স্বামী তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, কারণ তার স্ত্রী

তাঁকে ভালোবাসে। কিন্তু এমিলিয়ার চোখে সে আসক্তি নেই, এমিলিয়া আমায় ভালোবাসে না।
আচমকা সর্বাঙ্গ শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। আমি পাসেত্তির একটা কথাও শুনতে পাচ্ছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, না না. এমনি করে বসে থাকতে পারি না—এমিলিয়ার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো, দরকার হলে তার কাছ থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাবো।

বারবার চিন্তা করে মনে গভীর হতাশায় দৃঢ় সংকল্প করলাম। তবু পুরোমাত্রায় বিশ্বাস হলো না। প্রেম হারিয়েছি এমিলিয়ার, তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে, সিনেমার কাজ ছাড়বো। নির্মম নিশ্চিত এই অভিনব অনুভূতি। কেন? এই মর্মন্তুদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে চাই প্রমাণ—আরো পরিস্কারে ভাবে যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ। তার নিজের মুখ থেকে শুনতে হবে, যে আঘাতকে ততদিন ভ্রূক্ষেপ করিনি, আজ তার ভেতর দিয়ে শানিত ছুরি চালিয়ে তদন্ত করতে হবে। মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম। তবু বুঝলাম চরম অনুসন্ধানের পরেই এমিলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সাহস হবে।
আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। ধাত্রী এসে দাঁড়ালো পাসেত্তির বড় মেয়েকে নিয়ে। বাইরে নেবার আগে মেয়েকে বাপ-মাকে একবার দেখিয়ে নিতে এসেছে সে। মিসেস পাসেত্তি মেয়েটিকে বুকে নিয়ে তার কচি মুখে চুমু খেলেন।
এই দৃশ্য দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। ভাবলাম, এ সুখের স্পর্শ কোনদিনই পাবো না আমি। এমিলিয়া ও আমার সন্তান হবে না এ জন্মে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে অধীর হয়ে বললাম, এবার যাবো।
আমার অপ্রত্যাশিত বিদায়ে মিসেস পাসেত্তি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। হয়তো মনে করলেন, তাঁর মাতৃ মমতার মধুর দৃশ্য দেখে কেন এমন মোহিত হয়ে পড়লাম আমি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাতে দেড় ঘণ্টা সময়, কোন কাজ নেই। রাস্তায় নেমে অভ্যাস বশতঃ বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। আমি জানতাম, এমিলিয়া তার মার কাছে গেছে। তবু আশা করলাম, এমিলিয়া মনে হয় যায়নি, ঘরেই আছে। স্থির করলাম, তার সঙ্গে আজই যা করবার করে নেবো। হয়তো, এমিলিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে, বাত্তিসতার কাছ থেকে চিত্র-নাট্য সম্পাদনার কাজের দায়িত্ব নেবো না। সেও অনেক ভালো। অনিশ্চিত আমার অবস্থা—একদিকে মিথ্যা আর অন্য দিকে আত্মগ্লানি। আমি এখন সত্যই চাই ॥

বাড়ির কাছে এসেছ মন উদাসীন হয়ে গেল। এমিলিয়া যখন ঘরে নেই, তখন নতুন ফ্ল্যাটে ঢুকলেই মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। তার চেয়ে বাইরে থাকাই শ্রেয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাত্তিসতাকে কথা দিয়েছি, তিনি টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে দেবেন—কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এখন যদি বাড়ী না থাকি, তাঁকে তার পাওয়া যাবে না। এই সুযোগে বাড়ী যেতে পারি।

আমি লিফটে উঠে বোতাম টিপে দিলাম।

আর বাত্তিসতার সঙ্গে বোঝাপড়ার কি দরকার? এমিলিয়ার সঙ্গে যদি মনোমালিন্য ঘটে তাহলে আর কি প্রয়োজন। তবে, হ্যাঁ, এমিলিয়া এখন ঘরে নেই, বাত্তিসতার টেলিফোনের উত্তরে তাঁকে আমার মত জানানো যাবে না। এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে পড়া আরো অসঙ্গত হবে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি রি করছিল। এমিলিয়ার সঙ্গে দেখা করে বাত্তিসতাকে জানিয়ে দেবো, কি করবো। বোতাম টিপে নিচে নেমে এলাম।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে আরেকটা প্রসঙ্গ এসে হাজির হল। আচ্ছা, এমিলিয়া যদি আমাকে আগের মত ভালোবাসার অঙ্গীকার দেয় আর বাত্তিসতা টেলিফোন করে আমায় না পান? বাত্তিসতা তখন আমাকে না পেয়ে অন্য কাউকে কাজটা দেবেন। নিজেকে ভীষণ একা মনে হল। স্বার্থ ও প্রেমের মাঝ দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন দিকে যাবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি স্থানুর মত লিফটে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ এক জনৈকা তরুণী বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে লিফটে চড়লেন। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে লিফটের বোতাম টিপলেন।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলাম, একটা সোফার ওপর শুয়ে একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে এমিলিয়া পড়ছে। পাশে দুটি প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে রয়েছে। বাইরে যায়নি, আমাকে মিথ্যে বলেছে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করলো, কী হয়েছে তোমার?

আমি শ্বাস রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, তুমি মার কাছে যাও নি?

সহজ, স্পষ্ট স্বরে এমিলিয়া বললো—না, টেলিফোনে পরে মা বারণ করেছিলেন। অনেকক্ষন পরে তিনি ফোন করেছিলেন। ভেবে-ছিলাম, তুমি পাসেত্তির বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে আর জানাইনি।

হঠাৎ পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো।

মনে করলাম বাত্তিসতার ফোন এসেছে। তাঁকে বলবো, আমি আর চিত্রনাট্য করবো না, সব চুলোয় যাক, এমিলিয়া আমাকে আর ভালোবাসে না।

চুপ করে বসে থাকতে দেখে এমিলিয়া বললো, আরে দেখই না, কে ডাকছে?

অগত্যা ও ঘরে গিয়ে রিসিভার তুললাম। ওপর থেকে আমার

শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, এমিলিয়া আছে রিকার্ডো ?

আমি চাতুরীর আশ্রয় নিলাম। বললাম, না, সে তো আপনার কাছে যাবার জন্য বেরিয়েছে—সে আপনার কাছেই রয়েছে।

কেন, আমি তো আগেই টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছি—আজ ঝি আসেনি।

লক্ষ্য করলাম এমিলিয়ার ওপর, ওর চোখ দুটো আমার দিকেই অবস্থান করে আছে। বিড়বিড় করে দু একটা কথা বলে হঠাৎ নিজেরই ভুল সংশোধন করলাম, না-ও, ঐ যে এমিলিয়া আসছে—তাকে এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

আমি ইশারায় তাকে ডাকলাম। এগিয়ে এসে আমার দিকে না তাকিয়েই রিসিভার তুলে ধরলো। আমি শোয়ার ঘরে এসে এমিলিয়ার ইঙ্গিতে দরজা বন্ধ করে দিলাম। চুপ করে সোফার উপর বসে রইলাম।

এমিলিয়া অনেকক্ষণ ধরে রইলো রিসিভার। আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম। হামেশাই তো সে এমনি করে তার মার সঙ্গে কথা বলে, বিধবা মা, সে মাকে খুব ভালোবাসে। সে কোন কথা চেপে না রেখে সব বলে।

এক সময়ে এমিলিয়া দরজা খুলে ভেতরে এলো। কিন্তু তার মুখ চোখে ফুটে উঠেছে অসন্তোষ।

এমিলিয়া বলতে লাগলো, তুমি আমায় পরীক্ষা করছিলে তাই না ? দেখছিলে আমি যে মার কাছে যেতে পারিনি—এ কথা মিথ্যে না সত্যি ?

হয়তো তাই।

তুমি আর দয়া করে ওরকম কথা বলবে না। আমি সব সময় তোমায় সত্যি কথাই বলি। কখনও কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করি না। তাই তো সহ্য করতে পারি না আমি—

বাকি কথা না বলেই এমিলিয়া প্লেট ও গেলাস সমেত ট্রে-টি নিয়ে

বেরিয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য বিজয়ের তিক্ত আবেগে একাকী অনুভব করলাম।

তাহলে, সত্যিই এমিলিয়া আমায় ভালোবাসে না। শান্ত মধুর বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলতো, তুমি—তুমি ভেবেছিলে আমি মিথ্যে বলেছি? তারপর শিশুদের মত খিলখিল করে হেসে উঠতো। বলতো, তোমার নিশ্চয় হিংসা হচ্ছিল। আচ্ছা, তুমি কি জান না, তোমায় ছাড়া আর কাউকে আমি ভালোবাসি না?

শেষ পর্যন্ত চুম্বনে এর পরিণতি ঘটত। এখন সে যেন পাল্টে গেছে। প্রেম তার রূপ বদলেছে, তার সঙ্গে আমিও বদলে গেছি। সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে সবই আস্তে আস্তে অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

গভীর হতাশার অন্ধকারেও মানুষের মনে জেগে উঠে ক্ষীণ আশার আলো। তেমনি আমি পরিস্কার প্রমাণ পাচ্ছি, তবু সংশয়, সংশয় নয়, আশা। তবু, আমি এমিলিয়ার মুখ থেকেই সেই নিষ্ঠুর সত্য শুনতে চাই—সে আমায় ভালোবাসে না।

চোখ দুটি বাইরের দিকে প্রসারিত করে দিলাম। এমিলিয়া আবার দরজা ভেতরে এলো। আমার পেছনে সোফার ওপর পা এলিয়ে দিয়ে সাময়িক পত্রিকাটি হাতে তুলে নিল। আমি ওর দিকে না ফিরেই বললাম, চিত্রনাট্য সম্বন্ধে এক্ষুণি বাত্তিসতার আর একটি টেলিফোন আসবে। সেই ফিল্মটি খুব ভালো হবে। চিত্রনাট্য করে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে, লীজ-এর দুটো কিস্তি একসঙ্গে দিতে পারবো।

এমিলিয়ার কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। আমি আবার বলতে শুরু করলাম, এ কাজটি করতে পারলে আরো অনেক কাজ পাওয়া যাবে—ছবিটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে। তবে স্থির করেছি কাজটি করবো না।

ধীর, উদাসভাবে বললো এমিলিয়া—কেন?

আমি এমিলিয়ায় পাশে এসে বসে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কারণটা তোমার ভালোমতই জানা, এ কাজ আমার পছন্দ নয়, এক-

মাত্র তোমায় ভালোবাসি বলে, মূল্যবান ফ্ল্যাটটি কিনে কিস্তিতে টাকা দেওয়া ঠিক করেছি। কিন্তু তখন জেনেছি, তুমি আমায় ভালোবাস না আর, এ অনর্থক, কোন দরকার নেই এর—

এমিলিয়া কিছু না বলে বোকার মত কেবল তাকিয়ে রইলো।

তুমি আমায় আর ভালোবাসো না। কার জন্য এসব কাজ করবো? ফ্ল্যাটটি হয় বিক্রি করে দেবো নয়তো বাঁধা দিয়ে দেবো—এক্ষুণি বাত্তিসতা টেলিফোন করবেন—তাকে জানিয়ে দেবো, আর তাঁর কাজ করবো না।

আমার বক্তব্য শেষ করে উন্মুখ হয়ে এমিলিয়ার উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলাম। আমার বক্তব্য শুনে তার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। অবশেষে বললেন, তোমায় ভালবাসি না, কিসে বুঝলে? যেমন?

আগে তুমি বল, আমার ধারণা ঠিক কিনা।

না, আগে তুমিই বল।

সব—সব কিছুতেই, আমার সঙ্গে তোমার কথার ভঙ্গিতে, তোমার চোখের চাউনিতে, ব্যবহারে এক মাস আগেও তুমি আলাদা থাকতে চেয়েছিলে, এর আগে তো তুমি কখনও ওরকম করতে না।

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, আমি তার জল ভরা চোখ দুটি লক্ষ্য করলাম।

স্মিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে এমিলিয়া উত্তর দিল, বিশ্বাস কর, খড়খড়ি খুলে রাখলে আমার একদম ঘুম হয় না, তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, এছাড়া তুমি যা জোরে নাক ডাকো, আমার রোজ ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই, একা ঘুমুতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু তুমি তো আমাকে এর আগে কখনও বলোনি। আমি বিশ্বাস করলাম না ওর কথা। বললাম আমি জানি, তুমি আমায় ভালো-বাসো না, যে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে সে—তুমি যেমন করছো ঠিক তেমনি করে তার ভালবাসা দেখায় না।

এমিলিয়া আমাকে বাধা দিল। সত্যি তুমি চাও, আমি জানি না,

তুমি যখনই আমায় কাছে পেতে চাও, তখনই কাছে এসেছি, কখনও কি না করেছি তোমায় ?

আমি এমিলিয়ার স্পষ্ট কথায় লজ্জা পেলাম। যে এমিলিয়া এতদিন সংযত গম্ভীর ছিল—সে যেন তার শালীনতা বোধ ও সারল্য হারিয়ে ফেলেছে। এখন তার চরিত্রে কপটতা স্থান পেয়েছে।

এমিলিয়া আবার বললো, তুমি তাতেও খুশী হও নি। তাছাড়া শুধু সম্ভোগেই তৃপ্তি পাওয়ার পাত্র নও তুমি—তুমি তো ও কাজে পটু।

তাই নাকি।

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমায় ভাল না বাসলে তোমার প্রেম-লীলার আপত্তি করতাম, তোমায় পাশ কাটিয়ে চলতাম। মেয়েরা ইচ্ছে করলে একটা না একটা অছিলায় পুরুষকে এড়িয়ে যেতে পারে, না ?

বুঝলাম সবই, তবু, যে ভালবাসে, সে তোমার মত করে না।

কী করি আমি ?

যাই বল না কেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, ব্যস !

আমার মুখের গতিবিধি লক্ষ্য করলো। তার মুখটা কুঁচকে গেল, তুচোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়, মুখের হাঁ এক পাশে সরে গেল, স্তিমিত চোখের তারা চক্ষু কোটরের মধ্যে মোমের মতো গলে পড়লো। কোন বিপদে পড়লে কিংবা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে হলেই এমন অবস্থা হয় তার।

ও ওর নরম হাত তুটি দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, ছিঃ, ওকথা বলছো কেন রিকার্ডো। আমি তোমায় ভালোবাসি আজও। ভালোবাসি ঠিক আগের মতন।

এমিলিয়ার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কানে কপালে অনুভব করলাম। আমার মাথাটি বুকের ভেতর টেনে নিয়ে চেপে ধরলো।

আমার মনে হল, এ চাতুরী। মুখের ভাব লুকোবার জন্যই সে আমায় জড়িয়ে ধরেছে। তখন কিছু বললেই ও রেগে যাবে। তাই তার এ হাবভাব অর্থপূর্ণ হলেও চুপ করে রইলাম।

সে সাবধানী কণ্ঠে বললো, আচ্ছা, তোমায় যদি না ভালোবাসি, তাহলে কি করবে বলতো ?

আমি তাহলে ভুল করিনি। আমি জিতে গেছি এমিলিয়ার কাছে। তার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সে যেন পরিমাপ করতে চায়, জানতে চায়, তার স্পষ্ট উক্তির বিপর্দ কতটা। তার নরম উষ্ণ বুকে মুখ রেখেই বললাম, তোমায় তো প্রথমেই বলেছি, তাহলে বাত্তিসতার কাজটা নেবো না।

মনে করলাম, একবার তাকে জানিয়ে দিই তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাবো। কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সমর্থন পেলাম না। তখনও আশা করেছিলাম—সে ভালোবাসে আমায়।

মনোমালিন্যের ভয়ে আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। এমিলিয়া তার বুকের কাছে নিবিড় ভাবে টেনে নিল। বলল, সত্যিই—আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—এ সব সত্যি নয়—আজগুবি, মিথ্যে, এখন তুমি কী করবে—জান ? বাত্তিসতার ফোন এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার দিন ঠিক করে নাও, তারপর কাজটি আরম্ভ কর।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কেন, কেন আমি তোমার কথা শুনবো ?

বলেছি তো, আমি তোমায় ভালোবাসি, তবু কেন বারবার একই কথা বলাতে চাইছো–আমি তো তোমার সঙ্গেই রয়েছি—এও কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় ? তবে হ্যাঁ, যদি ভেবে থাক যে আমি তোমায় ভালোবাসি না বলেই কাজটা নিচ্ছ না, তাহলে তুমি ভীষণ ভুল করছো ?

মন কিছুটা আশ্বস্ত হল। তবু তার প্রেমের অকাঠ্য প্রমাণ পেতে চাই।

সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে আলিঙ্গন আলগা করে চাপা স্বরে বলল, একটা চুমু খাও না—খাবে না বুঝি ?

চুমু খাবার জন্য মুখটা তুলে ধরলাম। একি, তার মুখে অবসাদের ছায়া কেন ? তার চিবুকটি ধরে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট আনলাম।

এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। এমিলিয়া নিজেকে মুক্ত করে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে। আমি চুপ করে বসে রইলাম সোফায়।
এমিলিয়া বাত্তিসতার সঙ্গে দু চারটে কথা বলার পর বললো, এবার আপনার রিকার্ডোর সঙ্গে কথা বলুন, মিঃ বাত্তিসতা।
আমি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরলাম।
বাত্তিসতাকে জানিয়ে দিলাম, কাল তার অফিসে যাবো।
ইতিমধ্যে এমিলিয়া অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে তার কাজ হাসিল করেছে। এখন তার উপস্থিতি কিংবা সোহাগের প্রয়োজন নেই আর।

সপ্তম অধ্যায়

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটি পুরোনো আমলের বাড়ির দোতলায় বাত্তিসতার অফিস। এখানে আরও অনেক অফিস আছে। ছোট ছোট কাঠের পার্টিশান দিয়ে কামরাগুলি ভাগ করা আছে।
চিত্রনাট্য নির্মাতা বয়েসে এখনও তরুণ! কয়েক বছরের মধ্যে বেশ পয়সা রোজগার করেছে। তাঁর চিত্রনাট্য প্রতিষ্ঠানের নাম হলো—'বিজয় ফিল্মস।' এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য প্রতিষ্ঠান।
বাইরের ঘরে বেশ ভিড় জমেছে তখন। এ লাইনে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। মুখ দেখেই বলতে পারি, কে কোন উদ্দেশ্যে এসেছে। তাদের মধ্যে দুচারজন নাট্যকার, সিনেমা অরগানাইজার অভিনেতা, বেকার, পরামর্শদাতা, মিস্ত্রী রয়েছে। দু'তিনটে ভাবী অভিনেত্রীও চোখে পড়লো। তরুণী ও সুন্দরী হলেও ভাব-ভঙ্গিমায়, অতিরিক্ত প্রসাধনে ও পোশাকের চাকচিক্যে কিম্ভূতকিমাকার

দেখাচ্ছিল তাদের। ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠছে, সামনে তুজন মহিলা বসে আছেন, তাঁরাই যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

মাঝে মাঝে জোরে 'বেল' বেজে উঠছে, মহিলা তুজন এক একজন ভিজিটারের নাম ধরে ডাকছেন; তার ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে সাদা ও সোনালী দরজার ভেতর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আমি আমার নামটা লিখিয়ে ঘরের শেষ সীমান্তে গিয়ে বসলাম। আমার মনের ভাব অপরিবর্তিত রয়েছে। ভেবে দেখেছি, এমিলিয়া আমায় ভালবাসে। তবু ঠিক করেছি, বাত্তিসতার নতুন কাজটা করবো। প্রয়োজন হলে এমিলিয়ার কাছ থেকে তার মনের কথা জেনে নিয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারবো।

অনেকটা শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছি। কিন্তু জানি, এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী নয়, বেদনা, বিষণ্ণতা ও বিদ্রোহের ভাব মনে জেগে উঠবে। এতক্ষণ কেবল ভেবেছি। এমিলিয়া আমায় ভালবাসে কিনা। এবার মনে জাগল, না, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন—কেন সে ভালবাসে না আমায়? তার অবজ্ঞার কারণ জানতে পারলেই জোর করে কৈফিয়ৎ আদায় করা সহজ হবে।

মনে এই বিশ্বাস আনতে পারলাম না। আমাকে ভালো না লাগার কোন কারণই থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, অকারণেই সে আমাকে ভালবাসে না। কারণটা কী হতে পারে? সংশয় যেখানে বেশি সেখানেই মানুষ মনের মিথ্যা বিশ্বাসকে আশ্রয় করে আঁকড়ে ধরে, মনের আবেগে যা কিছু অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে তাই যেন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে চায়।

রহস্য কাহিনীর গোয়েন্দার মত আমি অনুসন্ধান করবো।

এমিলিয়া আমাকে ভালবাসে না, তার কারণটা কি? সে হয়তো অন্য কাউকে ভালবাসে।

এ ধারণাও মনে পোষণ করা যায় না। তার আচার ব্যবহারে এতটুকু সন্দেহ হয় না যে তার জীবনের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িয়ে আছে।

বরং তার উল্টো দেখা গেছে। আমার উপর বেশি নির্ভর করে। সারাক্ষণ একলা ঘরে কাটায়। দু'চারজন বান্ধবী ছিল, বিয়ের পরেও কিছুদিন বন্ধুত্ব বজায় ছিল, কিন্তু অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি তাতে বিরক্ত বোধ করলেও তার এতটুকু নির্ভরতা কমলো না, আর কাউকে খুঁজলো না। আজও সে একই ভাবে আমার প্রতীক্ষায় দিন গোণে। কিন্তু তার ভালোবাসাটুকু লোপ পেয়ে গেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, আমার ওপর ভালোবাসা না থাকলেও এটা প্রায় নিঃসন্দেহ যে আমি ছাড়া এমিলিয়ার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের স্থান নেই।

এছাড়া আর একটি প্রমাণ আছে, সে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। যা সত্য নয় কিংবা যার কোন অস্তিত্ব নেই, তা সে বানিয়ে বলতে পারে না। এটাই তার চরিত্রের বিশেষত্ব। চুপ করে থাকাও তার পক্ষে কঠিন নয়। তার ঔদাসীন্যের অর্থ অন্য জনের প্রতি আকর্ষণ নয়। কারণ যদি কিছু থাকে, তাহলে তা আমার জীবনেই সুপ্ত আছে।

আমি এত চিন্তায় মগ্ন ছিলাম যে শুনতেই পাচ্ছিলাম না, বাত্তিসতার সেক্রেটারী আমার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার বলছেন, মিঃ মলটেনি, আপনার জন্য ডাঃ বাত্তিসতা অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ চমকে উঠে আত্মস্থ হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটলাম।

ঝকঝকে সুসজ্জিত একটি ঘরে বাত্তিসতা বসেছিলেন। বাত্তিসতা লম্বা নন, কাঁধ দুটি বেশ চওড়া, দেহটাও মোটা, পা দুটো সেই তুলনায় সরু ও ছোট। মাথায় বিরাট টাক, ছোট ছোট চোখ, মোটা নাক, সারা গায়ে কালো কালো লোম। কিম্ভুতকিমাকার দেখতে হলেও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর, উচ্চারণ স্পষ্ট ও সুন্দর। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি।

বাত্তিসতার সঙ্গে অন্য আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন। বাত্তিসতা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, নাম রেনগোল্ড।

আমার সঙ্গে তার পরিচয় না থাকলেও নাম শুনেই চিনতে পারলাম। প্রাক মহাযুদ্ধের যুগে জার্মান চিত্রনাট্য নির্দেশক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

রেনগোল্ড আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

বাত্তিসতা বললেন, রেনগোল্ড ও আমি বলছিলাম ক্যাপ্রির কথা—ক্যাপ্রি জানেন তো, মিঃ মলটেনি?

হ্যাঁ।

বাত্তিসতা বললেন, ওখানে আমার একটা সুন্দর বাগানবাড়ি আছে। যেখানে গেলে আমার মতো নীরস পাকা ব্যবসায়ীরও কাব্য-চর্চা করতে ইচ্ছে করবে—সব ত্যাগ করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাত্তিসতা নিজের কথায় নিজেই মোহিত হতে শুরু করলেন, নয়ন মুগ্ধ প্রকৃতি, উদার নির্মল আকাশ, চির নীল সমুদ্র আর সর্বত্র ফুলের অপূর্ব সমারোহ। আপনার মতো লেখক হলে আমি ক্যাপ্রিতে বাস করে প্রকৃতির থেকে প্রেরণা জোগাতাম। কেবলই মনে হয়, শিল্পীরা কাাপ্রির প্রাকৃতিক দৃশ্য না এঁকে এমন সব ছবি আঁকে যার কোন মানে হয় না।

আমি কোন কথা না বলে রেনগোল্ডের দিকে আড়চোখে তাকালাম। বাত্তিসতা সমানে বলে চললেন, জানেন, এক এক সময় ভাবি—কাজ-কর্ম সব ছেড়ে কিছুদিন গিয়ে থাকি। কিন্তু সময়ের বড়ই অভাব। আমাদের চেয়ে ক্যাপ্রির লোকেরা ঢের বেশী সুখী। ওরা উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থপর নয়, তাই ওদের দুঃখ ও অভাবের মাত্রাও কম—সত্যিই কি সুখী তারা!

বাত্তিসতা মুহূর্তের জন্য কথা বন্ধ করলেন। আবার শুরু করলেন, জানেন, চিত্রনাট্য রচনার পক্ষে ক্যাপ্রিই হবে সর্বোত্তম স্থান, বাইরের প্রকৃতি থেকে উৎসাহ পাওয়া যাবে যথেষ্ট—বিশেষ করে রেনগোল্ডকে বলছিলাম—সেখানকার বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্রনাট্যের বিষয়-বস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে।

রেনগোল্ড বললেন, দেখুন বাত্তিসতা, কাজ যেখানে খুশী করা যায়—তবে, ক্যাপ্রি আমাদের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হতে পারে—যদি কয়েকটি 'শট' নেপল্‌স্ উপসাগরে গিয়ে নেওয়া যায়।
বাত্তিসতা বললেন, নিশ্চয়ই, রেনপোল্ড ঠিকই বলেছেন। আপনি ও আপনার স্ত্রী আমার বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকুন না, মিঃ মলটেনি—অন্ততঃ কেউ সেখানে থাকলে আমি খুশী হবো। সব সুবিধা রয়েছে সেখানে—ঝি-চাকর পেতে কোন কষ্ট হবে না।
সেই সময় এমিলিয়ার কথা মনে পড়লো আমার। কেন জানি না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো আমার ধারনা।
তাই বাত্তিসতাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, চিত্রনাট্য রচনার পক্ষে ক্যাপ্রিই যে প্রশস্ত এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই—আপনার বাগান বাড়িতে বাস করতে পারলে আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই আনন্দিত হবো।
বাত্তিসতা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে আমার হাতটা ধরলেন। তাহলে আপনারা ক্যাপ্রিতে যাবেন। বেশ, বেশ, এবার আমাদের চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।
মনে ভাবলাম, আমার এ হঠকারিতা নিশ্চয় সমর্থন করবে না এমিলিয়া। সত্যি, এমন আগ্রহ দেখানো ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল—ভেবে দেখি। লজ্জা বোধ করলাম তাই।
বাত্তিসতা বললেন, আমরা সবাই একমত যে চিত্রশিল্পে নতুনত্ব আমদানি করতে হবে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবো, কী চায়—আজকের দর্শক সমাজ?
প্রত্যক্ষ আক্রমণের পক্ষপাতী নন বাত্তিসতা। তিনি ছিদ্রান্বেষী নন—হয়তো নিজেকে সেভাবে জাহির করতে চান না। পরিষ্কারভাবে না বলাই তাঁর স্বভাব।
একটু চিন্তা করে বাত্তিসতা বললেন, আমার ধারনা, লোকে এখন আর একঘেঁয়ে উগ্র আধুনিক বাস্তবধর্মী চিত্র পছন্দ করে না, কারন

ওসব ছবি স্বাস্থ্যকর নয়। এ ধরণের ছবি মানুষের মনে প্রেরনা জাগাতে পারে না, জীবনকে অবিশ্বাসী করে তোলে, জীবনের অন্ধকার দিকটাই সেখানে প্রতিফলিত হয়, এসব ছবি সুস্থ আনন্দময় জীবন যাপনের পথ দেখায় না।

আমি বাত্তিসতার মুখের দিকে তাকালাম। তিনি যা বলছেন তা নিজে বিশ্বাস না করলেও তার কথার মধ্যে আন্তরিকতা রয়েছে।

বাত্তিসতা বললেন, এইমাত্র রেনগোল্ড যে প্রস্তাব করেছেন, আপনা-দের—মানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিপুঞ্জের কাছে হোমর অ্যাংলো স্যাঙ্গনদের 'বাইবেল' এর মতো—যেমন ধরুন, হোমরের 'ওডিসি'—'ওডিসির' রূপায়ন করেন না কেন আপনারা ?

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, গোটা ওডিসি, না তার কোন একটি উপাখ্যান ?

গোটা ওডিসিটা নিলেই ভালো হয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো, ওডিসিটা একবার ভালো করে পড়া—বুঝেছি—অতি বাস্তবধর্মী চিত্রে কোন জিনিষটার সত্যিকারের অভাব। সবার মুলে রয়েছে কাব্য। আপনিও রেনগোল্ড সেই কাব্য রসটুকু সংগ্রহ করবেন।

বললাম ওডিসি হলো একটি স্বতন্ত্র জগৎ, সেখান থেকে লোকে যা চায়, তাই পেতে পারে, তবে সেটা নির্ভর করে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর।

আমার উৎসাহের অভাব দেখে বত্তিসতা একটু ভীত হলেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বললেন 'ওডিসি' পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, তার কাব্যে সৌন্দর্য অতুলনীয় অপরূপ, বিজয় ফিল্মস আধুনিক রুচির উপযোগী করে ফুটিয়ে তুলবে ওডিসির' সেই অভিনব দৃষ্টিগুলি।

চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, বাত্তিসতার যা ধারনা আমার ধারনা তা নয়। হলিউড থেকে বাইবেল অবলম্বনে যেসব ছবি বেরোয় ঠিক তেমনি। সেখানে থাকবে দৈত্য দানব, নর নারী, প্রেম, প্রতিহিংসা, মারপিট।

বললাম, বিষয় বস্তুটি আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে, আমি হয়তো পারবো না, আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। দেখুন বাত্তিসতা, মনস্তত্ব মূলক চিত্রই আমার ভালো লাগে—আমার মনে হয়, আপনাদের প্রস্তাবিত চিত্রে শুধু দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নেই।

বাত্তিসতা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। রেনগোল্ড হঠাৎ বলে উঠলেন, চিত্রটি সম্বন্ধে মিঃ বাত্তিসতা বিশদভাবে সবই বলেছেন, অবশ্য চিত্র নির্মাতা হিসাবে বলেছেন, আপনি যদি মনস্তত্ব চান, তাহলে নিঃসন্দেহে কমিটি নিতে পারেন, কারণ চিত্রের কাহিনীর মধ্যে ইউলিসিস ও পেনিলোপ-এর মনস্তত্ব গৌন—আমি ছবি তুলবো এমন একটি লোক নিয়ে—যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে, কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসা পায় না পরিবর্তে।

হঠাৎ আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মনে পড়ে গেল এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা। প্রথম জাগলো—এমিলিয়া কেন ভাল-বাসে না ?

কল্পনা নয়নে দেখলাম—

আমি আমার চিত্রনাট্য লিখছি। এত কাজে ব্যস্ত যে আমার টাইপিষ্ট মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি একবারও। টাইপ মেশিনের চাবি টিপে ভুলটি সংশোধন করতে চাইলাম। হঠাৎ তার হাতে হাত লাগলো। সে হাতটা সরিয়ে নিল। এবার ইচ্ছে করেই তার আঙ্গুল স্পর্শ করলাম, তার মুখের দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হতেই বলল, মাফ করবেন, ভুলটা চোখে পড়েনি। তার-দিকে আবার নজর করলাম। আমি কি কোন আবেগ দেখিয়েছি। অবশেষে সে যা চেয়েছিল, তাই হলো, দৃষ্টি বিনিময় হলো, দুজনের ব্যাকুল চঞ্চলভাবে তার লাল ঠোঁটে একটি চুমো খেলাম।

সে যেন ভাবলো—আমায় তার নাগালের মধ্যে পেয়েছে। মুখ নীচু করে টাইপ করতে লাগলো। জানি তাকে আমি ভালোবাসি না, আমার কাছ থেকে সে জোর করেই চুমু আদায় করেছে, খর্ব করেছে

আমার পৌরুষের অভিমান।

ইচ্ছে করেই যেন আর একটা ভুল করলাম। শুধরে দেবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। মুখটি মুখের কাছে আসতেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রইলাম দুজনে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, এমিলিয়া ঘরে ঢুকলো, তারপরে তখুনি দরজা বেঁধে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে শঙ্কিতমনে শোবার ঘরে এলাম। আমায় দেখে বললো এমিলিয়া, ঠোঁটের লাল রঙটা দয়া করে মুছে ফেলো।

রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে ওর পাশে বসলাম। প্রথমা করতে চাইলাম, আমার কোন দোষ নেই। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো এমিলিয়া। বলল, সত্যিই যদি ঐ টাইপিষ্ট মেয়েটাকে ভালোবাসো, তাহলে বললেই পার—আমি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতাম বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব।

তার করুন, বিষাদমাখা কণ্ঠস্বরে যেন ফুটে উঠলো কৈফিয়ৎ চাওয়ার দৃষ্টি। আমি তাকে অনেক বোঝানো সত্বেও কোন কথা শুনলো না। শেষ পর্যন্ত আমায় ক্ষমা করতে রাজী হলো।

এমিলিয়া আমায় ছেড়ে চলে যাবে এ যেন অচিন্ত্যনীয়। আমি সেই-দিনই মেয়েটাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম, তাকে আর আমার দরকার নেই।

আগে একথা ভাবিনি কেন?

এমিলিয়া তখন দেখিয়েছে—ঘটনাটিকে সে গুরুত্বই দেয়নি, কিন্তু আসলে অজ্ঞাতসারে অশান্ত হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়? সে নীরবে মেনে নিয়েছিল—ওটা আমার সাময়িক দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু কষ্ট পেয়েছিল তাতে।

স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ রেনগোল্ডের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল, শুনছেন, মিঃ মলটেনি।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। গা ঝেড়ে ঠিক হয়ে বসলাম। আমি

আমার মতামত জানালাম' এক হিসেবে, ইউলিসিসের প্রতি পেনি-লোপের প্রেমই হলো সমগ্র ওডিসির ভিত্তি।

রেনগোল্ড স্মিত হাস্যে আমার এ উক্তি খণ্ডন করলেন।—কোন কোন ক্ষেত্রে আনুগত্যও একরকম প্রতিহিংসা—জোর করে ভালবাসা আদায় করা। আনুগত্য আর প্রেম এক নয়—

সত্যিই তো। আনুগত্য ও ঔদাসীন্যের জায়গায় যদি হতো বিশ্বাস-ঘাতকতা—তাহলেও দুঃখ থাকতো না। যদি অবিশ্বাসিনী এমি-লিয়ার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম না। কিন্তু তার বদলে আমিই যে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি তার কাছে।

মন অথৈ সাগরে ডুব দিচ্ছিল, অশান্ত হয়ে উঠলাম বাত্তিসতার কথায় কথায়—তা হলে আপনি রেনগোল্ড-এর সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছেন, মিঃ মলটেনি?

হ্যাঁ-হ্যাঁ-রাজী।

বাত্তিসতার মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তি ও আনন্দ। বললেন, তাহলে রেনগোল্ড এক সপ্তাহের জন্য প্যারিসে যাচ্ছেন। আর আপনি এর মধ্যে ওডিসির একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে ফেলুন। রেনগোল্ড ফিরে এলেই আমরা ক্যাপ্রিতে যাবো। কাজ শিগগীরই আরম্ভ করবো।

রেনগোল্ড ও আমি উঠে দাঁড়ালাম। অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে নির্লিপ্ত সুরে বাত্তিসতা বললেন, আপনার চুক্তিপত্র তৈরী আছে, এছাড়া সঙ্গে সঙ্গে আপনার পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু একবার সেক্রেটারী সঙ্গে দেখা করে সই করে টাকাটা নিতে হবে আপনাকে।

আমি ওঁর ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে চুক্তিনামায় সই করে চেকটি নিয়ে এলাম।

বাত্তিসতা রেনগোল্ড-এর সঙ্গে করমর্দন করলেন, তারপর আমার কাঁধ চাপড়ে নতুন কাজে সাফল্যের জন্য তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন।

বাত্তিসতা তাঁর দপ্তরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে রেনগোল্ডের দিকে তাকালাম। তিনি যেন আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে জড়িয়ে ধরে কানের ওপর মুখ রেখে বললেন, কিছু ভাববেন না মশায়—বাত্তিসতা যা বলেন বলতে দিন, আমরা মনস্তত্বমূলক ছবিই তুলবো—একেবারে খাঁটি মনস্তত্ব মূলক।

আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চললেন। আমিও সামনের দিকে অগ্রসর হলাম।

অষ্টম অধ্যায়

বেলা সাতটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি এমিলিয়া নেই। বুঝলাম, বাইরে গেছে, দুঘণ্টার আগে ফিরবে না। গভীর হতাশয় মনটা বিষয়ে গেল। ভেবেছিলাম, সেই টাইপিষ্ট গার্লের সম্বন্ধে কথা বলবো আজ। সেই চুম্বনই অসন্তোষের মূল কারন। কয়েকটি কথা বলে এমিলিয়ার মনের মেঘ কাটিয়ে ফেলবো, তারপর তাকে দেবো সুসংবাদ। বলবো—"ওডিসি" চিত্র-নাট্যের কথা, অগ্রিম টাকা পাওয়ার কথা, ক্যাপ্রিতে যাবার কথা।

এখন মাত্র দুঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। দু'ঘণ্টা পরে হয়তো মনের বল থাকবে না। তবু সংশয়, চঞ্চল, বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে শেলফের ওপর থেকে "ওডিসির" অনুবাদটি খুঁজে বার করে নিলাম, তারপর টাইপ রাইটার এ কাগজ লাগিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সংক্ষিপ্তসার তৈরী করতে বসলাম।

কিছুটা টাইপ করার পর নানা চিন্তা মনের মধ্যে এসে ভিড় করলো। অবসন্ন মন নাগালের বাইরে চলে গেছে, তাকে কিছুতেই হাতের

মুঠোয় আনতে পারছিলাম না।

বিতৃষ্ণা এসে গেল নিজের এই বৃত্তির উপর। আর আসবে নাই বা কেন? জেনেছি এমিলিয়া ভালবাসে না আমায়। এতদিন শুধু তাকে খুশী করার জন্য কাজ করেছি। আমার উপর যদি তার ভালবাসা নেই, তাহলে কাজ করে কি লাভ?

কতক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দও পায়ের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম এসেছে। দরজটি ঠেলে বন্ধ করে এমিলিয়া আমার পাশে এলো। বললো—বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করেছো?

হ্যাঁ, সবই ঠিক হয়ে গেছে, অনেক টাকাও দেবেন এবং চুক্তিপত্রে সইও হয়ে গেছে। একটির বিষয় বস্তু হল "ওডিসি"। কিন্তু আমার ওটা করতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু আজ সকলেও তো ইচ্ছে ছিল তোমার।

এই তো তার সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ। আমি চেয়ার ছেড়ে ওর হাতখানি চেপে ধরলাম, বললাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। সজোরে টানতে টানতে পাশের ঘরের একটি চেয়ারের দিকে তাকে ঠেলে দিলাম। বললাম, বসো, এবার শোন।

অসহিষ্ণুভাবে আমার দিকে চেয়ে এমিলিয়া বলল, বল—

মনে পড়ে, কাল তোমায় বলেছিলাম, তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা ঠিক জানিনা বলেই চিত্রনাট্য সম্পাদনার ভার নেবার ইচ্ছে নেই—তুমি বলেছিল, আমায় ভালোবাসো, কাজটি নেওয়া উচিত—না? কিন্তু আমি বলেছিলাম, তুমি মিথ্যে বলেছো—আমারই প্রতি সমবেদনায়, করুনায় কিংবা নিজের স্বার্থে।

বাধা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল কি স্বার্থে?

আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটলো ওর চোখে মুখে। চেঁচিয়ে উঠে বললো, কে বলেছে তোমায়, তুমি আমায় জান না, যে কোন মুহূর্তে আমি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে পারি, আমার কাছে এটা অতি সামান্য—

মনে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম, এই ফ্ল্যাটের জন্য আমি কিনা করেছি? নিজের আদর্শ উচ্চাকাঙ্খা সব বিসর্জন দিয়ে চিত্রসম্পাদকের কাজ নিয়েছি। এ যেন আমার কল্পনার বাইরে।

আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ বেড়েই চলল। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হল না। নিজেকে সংযত করে বললাম, আচ্ছা, সে কথা থাক, কাল কোন কারণে বলেছ, আমায় ভালোবাসো একথা মিথ্যে—তাই একাজে উৎসাহ নেই আর, কি লাভ হবে কাজ করে? আমি খুসি, তুমি আর আমায় ভালোবাসোনা।

জানলার দিকে চেয়ে ক্লান্ত বেদনার্ত কণ্ঠে সে বললো, কেন এসব জানতে চাও তুমি? এসব নিয়ে মাথা ব্যথা করো না, দুজনেরই মঙ্গল হবে। আমি কিছুই বলতে চাই না। কেবল একটু শান্তি চাই। আমি এবার যাই। জামা কাপড় ছাড়া হয়নি—

সে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেই আমি ধরে ফেললাম হাতটা। সে আমাকে বাধা দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বললো—বল, কী চাও তুমি? ও হ্যাঁ, কয়েকটা কথা বলার ছিল। যাক, আমার হাতটা ছেড়ে দাও।

সে তার হাতখানি ছাড়িয়ে নিতে চাইল না, নড়ল না এক পাও। এই অবজ্ঞামাখা আত্ম সমর্পনের চাইতে সে যদি বিদ্রোহ করতো, তা হলে ভালোই হত। ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সজোর বুকের ওপর চেপে ধরলাম। হঠাৎ উত্তেজনা অনুভব করলাম। পরক্ষনেই মনে নিরাশার ঝঙ্কার বেজে উঠলো।

আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না। সত্যি কথা বলতে হবে এক্ষুনি—সত্যি কথা না বলে এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল এমিলিয়া। আমার মাথার ওপর তার চঞ্চল দৃষ্টি অনুভব করলাম? শেষে বললো—ঠিক আছে শোন তবে, ভেবেছিলাম যেমন চলছে চলুক, কিন্তু সত্যিই তোমায় আর ভাল-বাসতে পারি না আমি।

যখন কোন কল্পনা নির্মম সত্যের আকার ধারণ করে তখন বেদনায় ছেয়ে যায় মন, বিশ্বাস হয় না কিছুতেই—এ সত্য। জানি. এমিলিয়া আমায় ভালোবাসে না। তবু তার মুখে একথা শুনে বুক কেঁপে উঠলো। এ যেন কল্পনা নয়—অবাঞ্ছিত সত্য।

প্রকৃতিস্থ হয়ে যথাসম্ভব ধীর কণ্ঠে বললাম, এসো বসো—বল, কেন ভালোবাস না আমায় ?

কি আর বলবো ? তোমায় ভালবাসি না. এই পর্যন্তই।

সীমাহীন অবক্ত্য বেদনা সর্বাঙ্গে কাঁটার মত বিদ্ধ হল। তবু মুখে ম্লান হাসি টেনে বললাম, এ কথা অস্বীকার করবে না নিশ্চয়—কারনটা আমায় জানানো দরকার ? আচ্ছা, তুমি তো আগে আমায় ভালোবাসতে।

হ্যাঁ, আগে বাসতাম। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। কোন কারন নেই। শুধু জানি, আমি তোমায় ভালোবাসি না।

এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই।

তুজনে খানিকক্ষন চুপ করে বসে রইলাম। শেষে বললাম, ভালো না বাসার কারণটা যদি আমি বলে দিই, তাহলে তুমি সত্যি বলবে ?

বেশ, বল, শুনি।

কারণ আমার চিত্রনাট্যটি টাইপ করছিল যে মেয়েটি তাকে আমি চুমু খেয়েছিলাম একটা। এটাই প্রথম এবং শেষ। এবার সত্যি করে বলো তো ঐ চুমুটাই কি আমাদের ব্যবধানের মূল কারণ নয় ?

বিস্ময় ও অস্বীকৃতির চিহ্ন ফুটে উঠলো এমিলিয়ার মুখে। ধীরে ধীরে মুখের ভাব বদলে বললো—আচ্ছা যদি তাই হয়, কী হবে জেনে ?

বুঝলাম, সামান্য একটি চুম্বনই তার অকৃত্রিম ভালোবাসা হারাবার কারন নয়, আরো মারাত্মক কারন আছে। নিষ্ঠুর নয় এমিলিয়া। আমি ব্যথা পাবো বলেই আসল কথাটি বলছে না— সত্য প্রকাশ করছে না।

আমি তবু বারবার একই প্রশ্ন করে চললাম—আর কোন কারণ

আছে।

মা যেমন অশান্ত শিশুকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি বিরক্ত হয়ে উঠলো এমিলিয়া।

না, তুমি সত্যি কথা না বলে যেতে পারবে না।

বলেছি তো, তোমায় আমি ভালোবাসি না।

কি গভীর প্রতিক্রিয়াই না শুরু হলো ঐ তিনটি শব্দে। মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, ভেবেছো কী, তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, ভেবেছো কী, তোমার সঙ্গে খোস গল্প করতে এসেছি।

এমিলিয়ার ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে দিলাম। গর্জে উঠলাম—এক্ষুনি বল, আসল কারণ কী।

এমিলিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। ওর মুখটা লাল হয়ে গেল।

তার গলা জোরে টিপে ধরলাম। চিরদিনের জন্য শত্রু করে রাখার চেয়ে খুন করে ফেলাই ভালো।

আমার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে এমিলিয়া নিজেকে মুক্ত করে নিল, না না না, তোমায় আমি ভালোবাসি না। আমি তোমায় ঘৃণা করি, তোমার স্পর্শে বিরক্তি অনুভব করি। এই হল আসল কথা।

নবম অধ্যায়

এমিলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কিছুদিন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েছিল। তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখে। তার বাপ অর্থদপ্তরে সামান্য মাইনের কাজ করতেন। তবে সদ্বংশে তার জন্ম। সাধারণ জ্ঞানই এমিলিয়ার

একমাত্র সম্বল। কোন বিষয় সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে সত্যেরই মতো অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করতে পারতো এমিলিয়া। কিন্তু নিজে তা বুঝতে পারতো না। তাই আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পেতো না।

তাই যেদিন এমিলিয়া জানালো—আমি ভালোবাসি না তোমায়, ঘৃণা করি—সেদিনই আমার মনে এতটুকু সন্দেহ রইল না, যে তার কথা একবিন্দুও মিথ্যে নয়। তবু লক্ষ্য করলাম, সে যেদিন আমার তার প্রথম প্রেম জানিয়েছিল, সেদিন যেমন অকপটে বলেছিল, আমি তোমায় ভালবাসি—আজও ঠিক তেমনি সরলভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছে, আমি তোমায় ঘৃণা করি।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। নিজের বোধশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি। বিত্তহীন হলেও নিজের ওপর এতদিন আমার শ্রদ্ধা ছিল। জীবনে আজ প্রথম অনুভব করলাম—এতদিন কেবল মিথ্যা তোষামোদ করে এসেছি নিজেকে।

মস্তিষ্কের ভেতর যেন দাবানল জ্বলছে। বাথরুমে গিয়ে কলের তলায় মাথা দিলাম। তারপর শোবার ঘরে ফিরে এলাম। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এখানে বসে দুজনে রোজকার মতো এক সঙ্গে খেতে পারবো না। এঘরেই যে ধ্বনিত হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর শব্দহীন, যা শুনে এমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছি আমি।

দরজা ঠেলে এমিলিয়া দেখলো। ওর মুখের ভাব এমনই, যেন কিছুই হয়নি।

তার দিকে না তাকিয়েই বলে দাও—পিকে বলে দাও, আজ বিকেলে এখানে খাবো না। আমরা বাইরে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো।

একটু পরেই বেরোলাম। গাড়িতে উঠলাম, পাশে বসলো এমিলিয়া দুজনের অবস্থানের মধ্যে একটু ফাঁক রয়ে গেছে।

আপ্পিয়ার পথে গাড়ি চালাতে লাগলাম। নগরীর মাথপথ ফেলে

শেওলা-ঢাকা প্রাচীন প্রাচীর, বাগান, ছায়াঘেরা বাগান-বাড়ি সব পেছনে ফেলে প্রবেশ পথে পৌঁছলাম।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখলাম—টেবিল খালি, বেয়ারারা অলসভাবে গল্প-গুজব করছে। এখানে বড্ড শীত, তাই এখন কেউ বেড়াতে আসে না।

মেনু নিয়ে এলো বেয়ারা। ডিনারের অর্ডার দিলাম। তালিকা পড়ে শোনালাম। এমিলিয়া মদ খাবে না জেনেও এক বোতল দামী মদ নিলাম।

টেবিলে খাবার এলো, দুজনে খেতে লাগলাম।

এতদিন সবই হতো সহজ সরলভাবে, ছোটখাটো ব্যাপারে খেয়ালই ছিল না, একটা কিছু করে ফেলার পর চৈতন্য হত আমার। আমার প্রতিটি ভঙ্গীতে যেন লেগে রয়েছে এক বেদনা ময় অর্থহীন অকারণ অসমর্থ চেতনা। স্তব্ধ অবশ হয়ে পড়লাম। বারবার ভাবতে লাগলাম, আমি ভুল করছি না তো?

দুজনেই নীরব, মাঝে মাঝে দু'একটি ভাঙা ভাঙা কথা—রুটি চাই, তোমার—মাংস—মদ—

আমাদের মিলিত জীবনে অমর হয়ে রয়েছে সেই সন্ধ্যা।

কত কিছু বলতে চাই, কিন্তু পারছি না, ভেবেই পাচ্ছি না কী বলবো? মনের আবেগ রুদ্ধ করে নীরব রইলাম তাই। কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না, তবু মনে হলো চুপ করে থাকাই ভালো, মৌনতা ভাঙলেই তো এক তিক্ত আলোচনার মধ্যে নিজেকে টেনে আনতে হবে।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম চুপ করে আছ কেন, এমিলিয়া, একটু আগে যা বলেছ, তাই নিয়েই তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা যেতে পারে।

ভুলে যাও ওকথা, মনেকর কিছু বলিনি—

আশায় দীপ্ত হলো অন্তর—হয়তো তার কথাই ঠিক, তার উপর বল

প্রয়োগ করেছিলাম, তাই সে ঘৃণা করেছিল আমায়।

তাই সাবধানতার সঙ্গে বললাম, তবে বল, আজ যে ভয়ঙ্কর উক্তিটি করেছ তা সত্যি নয়, শুধু একবার বল—তখন সেই মুহূর্তে তোমার মনে হয়েছিল—আমায় ঘৃণা কর তুমি।

আমার দিকে তাকালো সে। কিন্তু একি! ভুল করিনি তো? ভালো করে দেখলাম। না, সন্দেহ নেই এতটুকু। সত্যিই তার দুটি চোখ জল ভরা।

আমি তাই আনন্দিত হয়ে তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলাম, বললাম, বল এমিলিয়া, বল প্রিয়তমে, সত্যি নয়—সত্যি নয়, তোমার কথা—

একটানে হাত সরিয়ে নিল সে। বলল, সত্যি।

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সেজানে একটি মিথ্যে কথা বললেই সব গোলমাল চুকে যায়।

বলতে হবে, কেন তুমি আমার ঘৃণা কর।

মরে গেলেও বলবো না।

রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম হঠাৎ। খপ করে তার হাত ধরে বললাম, বল, বল—কেন ঘৃনা কর আমায়?

রাগে তার আঙুলে চাপ দিলাম।

উঃ। বেদনায় মুখখানি কুঞ্চিত করলো এমিলিয়া। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, থাম, থাম—ছিঃ, আরও ব্যথা দিতে চাও আমায়?

আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল এমিলিয়ার কথা শুনে। আগে যেন আমি তাকে এভাবে ব্যথা দিয়েছি। তবু তার হাত ছাড়লাম না।

এমিলিয়া বলল, ছিঃ, লজ্জা করে না তোমার? বেয়ারারা দেখছে—আঙ্গুল ঘুরিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল এমিলিয়া। একটা গেলাস মাটিতে পড়ে গেল।

এমিলিয়া একলাফে দরজার কাছে গিয়ে বললো, আমি গাড়িতে যাচ্ছি, তুমি বিলটা মিটিয়ে দাও।

এমিলিয়া আসার পর আমি কিছুক্ষণ স্থানুর মত বসে রইলাম। বেয়ারারা বসে বসে আমাদের লক্ষ্য করেছে সর্বক্ষণ। তাই লজ্জায় চেয়ে অপমান বোধই বেশি করলাম। এক অপ্রীতিকর প্রহেলিকার মতো কানের কাছে বাজতে লাগলো সেই শব্দটি—"আরও"।
বিলটা মিটিয়ে দিয়ে রেঁস্তোরার বাইরে এলাম।
মাথার ওপর আকাশে টুকরো টুকরো মেঘে ছেয়ে আছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। লক্ষ্য করলাম, এমিলিয়া গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। গাড়ির দরজা তালা বন্ধ।
তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কম্পিত কণ্ঠে বললাম, ইস, ভুলেই গিয়েছিলাম—গাড়ির দরজা বন্ধ, কিছু মনো করো না, লক্ষ্মীটি।
সে শান্তভাবে বললো, না, সামান্য বৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কি হয়েছে তা'তে?
দরজা খুলে গাড়িতে উঠলাম, এমিলিয়া পাশে বসলো। আনন্দের সঙ্গে গাড়ি চালাতে লাগলাম। মনে হয়, সমস্ত ঘটনাটিকে কৌতুক হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যাবে, এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কে সমস্যা মিটবে।
এমিলিয়া নীরব। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে গাড়ি চলেছে। কিছুদূর এগিয়ে এসে কৃত্রিম উল্লাসভরে বললাম, চল এবার আমরা ভুলে যাই নিজেদের, মনে কর, আমরা দুটি তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, দুজনে খুঁজে বেড়াচ্ছি নির্জন কোন, রচনা করবো নিভৃত মিলন-কুঞ্জ।
তবুও এমিলিয়া চুপ। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সাহসে ভর করে গাড়ি থামলাম। বললাম, মনে কর, আমি মেরিও, আর তুমি মেরিয়া. অবশেষে আমরা খুঁজে পেয়েছি বৃষ্টি ভেজা একটি নিস্তব্ধ স্থান, কিন্তু আমরা তো রয়েছি গাড়িতে, এসো, একটু আদর করো আমায়—
হাত দিয়ে জড়িয়ে তার কাঁধে চুমু খেতে গেলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, ছিঃ, তুমি কি পাগল হয়েছো, না নেশা করেছো?
না, আমার কিছুই হয়নি, তুমি কেবল একটি চুমু খেতে দাও।

আবেগের সুরে সে জানালো, ও কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি যখন বলি, তোমায় ঘৃণা করি, তখন আশ্চর্য হয়ে যাও, অথচ যখন এমন ব্যবহার কর, এত কিছু হবার পরও—

কিন্তু আমি যে তোমায় ভালোবাসি।

আমি তোমায় ভালোবাসি না।

মনে ধিক্কার এলো। তবু বললাম, একটি চুমু খাও, লক্ষীটি। যাও।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম এমিলিয়ার গায়ের ওপর। সে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লো গাড়ি থেকে।

বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগলো। আমিও রাস্তায় নেমে পড়লাম। উত্তেজিত ভাবে ভাবলাম, এমিলিয়া, এমিলিয়া, ফিরে এসো তোমার কোন ভয় নেই—তোমায় স্পর্শ করবো না আর—

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। দূর থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, তুমি এসো না, ওখানেই থাক নইলে কিন্তু হেঁটেই রোমএ চলে যাবো আমি।

বৃষ্টিতে জামা ভিজে গেল, গা বেয়ে জল পড়তে লাগলো টপটপ করে। গাড়ির আলোয় বেশিদূর দেখা যাচ্ছিল না। চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম, না এমিলিয়াকে। নিরাশ হয়ে ভাবলাম, এমিলিয়া—

এমিলিয়া আমার কান্না পেয়ে গেল।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এমিলিয়া দাঁড়ালো আমার সামনে। বলল, দিব্যি করে বল, আমায় ছোঁবে না।

তার কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। এমিলিয়া গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি চালাতে লাগলাম আবার। দু একবার হাঁচলো এমিলিয়া— যেন দেখালো, আমারই জন্য তার সর্দি হয়েছে।

গাড়ী চালাতে চালাতে স্বপ্ন দেখলাম, এক দুঃস্বপ্ন—

আমি রিকার্ডো, আমার স্ত্রীর নাম এমিলিয়া—আমি তাকে ভালোবাসি, সে আমায় ভালবাসে না, ঘৃণা করে।

দশম অধ্যায়

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন শরীরে অসহ্য বেদনা অনুভব করলাম। অবসন্ন নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। এমিলিয়া তখনও ঘুমুচ্ছে। আধো অন্ধকারে অলসভাবে শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ঘুমে ভুলে যাওয়া বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলাম আস্তে আস্তে। স্থির করতে হবে, ওডিসি'র চিত্র সম্পাদনার ভার নেবো কিনা, জানতে হবে' এমিলিয়া কেন ঘৃনা করে আমায়, আবিস্কার করতে হবে, তার ভালবাসা ফিরে পাওয়ার উপায়।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার জীবনের এই তিনটি বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এমনি করে সমাধান করার চেষ্টা করা কি শুধু শক্তির অপচয় নয়?

কল্পনার চোখে দেখলাম—আমি 'ওডিসি'র চিত্রনাট্য রচনা করছি। এমিলিয়ার সঙ্গে আমার কোন মনোমালিন্য নেই, আমার সঙ্গে তার অবজ্ঞা শিশু সুলভ ভুল বোঝাবুঝি মাত্র। তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আবার।

ভাবতে ভাবতে একটু ঘুমের আচ্ছন্ন ভাব নেমে এলো চোখে। ধীরে ধীরে কখন গভীর ঘুমে ডুবে গেছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখি—এমিলিয়া চির-পরিচিত বেশে সেজে গুজে বসে আছে আমার পায়ের কাছে। টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। কখন ল্যাম্পের আলো বাড়িয়ে এমিলিয়া এসে পাশে বসেছে জানি না।

মনে পড়লো—হারানো অতীতের মধুর স্মৃতির কথা। চাপা কণ্ঠে বললাম—বল, বল এমিলিয়া, তুমি ভালবাস আমায়—

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমাদেরই সম্বন্ধে—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আর কি বলার বাকি আছে ?
তুমি আমায় ভালোবাসো না, ঘৃণা কর—
সে কথা নয়। বলছি, আজ আমি মার কাছে যাচ্ছি। তোমাকে বলে তারপরে মাকে টেলিফোন করবো।
এ ধারণা তো মনে কোনদিন উদয় হয়নি, এমিলিয়া আমায় ত্যাগ করে চলে যাবে। আমার প্রতি তার নিষ্ঠুরতার সীমা বাড়িয়ে চলেছে। আমি তবু তার উক্তির মানে বুঝতে পারলাম না।
বলছ, আমায় ছেড়ে চলে যাবে ? যদি তাই হয়, তবে তুমি অমন করে যেতে পারবে না। আমি চাই না, তুমি যাও।
ছেলেমানুষি করো না। বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমাদের মধ্যে আর কিছু বাকী নেই। এতে তুজনেরই ভাল হবে—
আমার ঠিক মনে নেই, তার উক্তির পরিবর্তে আমি কি বলেছিলাম। তবে মনে পড়ে—হাত পা ছুঁড়েছিলাম, ঘরের ভেতর পায়চারি করেছিলাম, এমিলিয়াকে বার বার বলেছিলাম—যেয়ো না, যেয়ো না। তাকে জানিয়েছিলাম আমার মনের অবস্থা। আরও কত কি বলেছিলাম।
বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার চিন্তায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলো আমার মন। বিশ্বাস হলো না কিছুতেই। আশঙ্কা ও ভয়ের মেঘ আমার চারপাশে বেষ্টন করে আছে। তারই ফাঁকের মাঝে মাঝে এমিলিয়ার নিশ্চল মুখটা দেখা যাচ্ছে !
সে বলল, রিকার্ডো অবুঝ হয়ো না। এই হলো আমাদের উপায়।
যা বলতে চেয়েছিলাম, কিছুই বলা হল না। নিজেকে সংযত করে বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইলাম।
আজই আমি চলে যেতে চাই। আমার দিকে না তাকিয়েই সে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
এ যেন আমারই ভুল ? ঘরের চারদিকে একবার নজর বোলালাম।

তীব্র উত্তেজনায় মনে হলো—ঘরটির রূপ বদলে গেছে। এ সেই ঘর, যে ঘরে এমিলিয়া নেই, আর কখনও ফিরে আসবে না। আমাকে অনির্দিষ্টকাল ধরে একা কাটাতে হবে। ভবিষ্যতের ছবি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডদেশ দিয়ে বেয়ে নামলো।

আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। চলে এলাম শোবার ঘরে। লক্ষ্য করলাম, এমিলিয়া বিছানার ওপর বসে টেলিফোন করছে। তু একটা কানে আসতেই বুঝলাম, সে বার মাকে ফোন করছে। অদূরে বসে মুখখানি হাত দিয়ে চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগলাম। ঝাপসা চোখে দেখলাম—প্রকৃতির উপর কালো মেঘের ছায়ার মতো একটি নিরাশ রুষ্ট ভাব ফুটলো এমিলিয়ার মুখের ওপর।

এমিলিয়া এবার রিসিভারটা রেখে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। সে যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। তার হাতটা ধরে বললাম, যেয়ো না, যেয়ো না, লক্ষ্মীটি আমার।

শিশু, নারী আর কাপুরুষেরা ভাবে চোখের জলের আবেদন গভীর। চোখের জলে সহজেই মানুষের মন গলানো যায়। মনের তুঃখেই কাঁদছিলাম। কিন্তু চোখের জল ফেলছিলাম কাপুরুষের মতো। আশা ছিল, আমার অশ্রু দেখে এমিলিয়ার মনে মায়া হবে। পর-মুহূর্তেই মনে হল, এমিলিয়াকে ছলনা করার জন্যই চোখের জল ফেলেছি। লজ্জা পেয়ে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। চেয়ারে বসে অনিচ্ছা সত্বেও একটা সিগারেট ধরালাম।

এমিলিয়া এসে জানাল, তোমার কোন ভাবনা নেই; ভয়ের কোন হেতু নেই—আমি যাচ্ছি না, যাচ্ছি না।

বিচলিত ও বিব্রত দেখালো তাকে। লক্ষ্য করলাম, ওর ঠোটের তুটি কোন কাঁপছে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সে।

কান্না ভেজা কণ্ঠে বললো, আমার মা আমায় চান না। আমার

ঘরটি তিনি ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। আমি যে যাচ্ছি, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না। কেউ চায় না আমায়, তোমারই সঙ্গে থাকতে হবে আমায় বাধ্য হয়ে।

এ কি নিদারুণ উক্তি! কে যেন ছুরি বসালো আমার বুকে। ঘৃণা জড়িত কণ্ঠে বললাম, আমার সঙ্গে অমন করে কথা বলছ কেন? বাধ্য হবে কেন? কেন তুমি অমন ঘৃণা কর আমায়?

এমিলিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর চোখ মুছে বললো, তুমিই তো আমায় যেতে দিতে চাও নি। তা বেশ, আমি থাকছি, তোমার তো খুশিই হওয়া উচিত—না?

আমি মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

এমিলিয়া বলে চললো, যদি তুমি চাও, তাহলে আমি চলে যাবো, আবার টাইপিষ্ট হবো। তবে বেশিদিন তোমাকে সাহায্য করতে হবে না। একটা কাজ পেলেই তোমার কাছে কিছু চাইবো না।

না না, এমিলিয়া—আমি চাই, তুমি এখানেই থাক—কিন্তু আবার বলছি, বাধ্য হয়ে নয়, বাধ্য হয়ে নয়। বেশ, আর আলোচনার কাজ নেই, তাতে কেবল কষ্টই বাড়বে। হ্যাঁ, একটা কথা—আমি 'ওডিসি' চিত্রনাট্যের ভার নিয়েছি। কিন্তু বাত্তিসত্তা বলেছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলার জন্য ক্যাপ্রিতে যেতে হবে। আমরা সেখানে যাবো, তুমি তোমার ইচ্ছে মতো নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে পারবে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। এই তিন চার মাসের মধ্যে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাতে পারবে। এর আগে সে সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলবো না।

পরিচালক প্যারিস থেকে ফিরে এলেই আমরা যাবো। প্রায় দিন দশেক পরেই যাবো।

এমিলিয়ার নরম বুকটি তখনো আমার বুকে লেগে রয়েছে। একটা চুমো খাওয়ার ইচ্ছে হল। আমার বেষ্টনে সে রয়েছে নির্বিকার। শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলো—সেখানে আমরা কি হোটেলে থাকবো?

আমি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললাম, হোটেল কেন? হোটেলে কি থাকা যায়? বাত্তিসতা তার বাগান বাড়িটি দেবেন। সেখানেই আমরা থাকবো।

এমিলিয়ার মুখ ভঙ্গি দেখে মনে হল, পরিকল্পনাটা তার মন মতন হয়নি। সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল—বাত্তিসতা হয়তো মাঝে মধ্যে সেখানে যাবেন। অল্প সময়ের জন্য, শুধু উনি দেখবেন, কাজটা কেমন এগোচ্ছে। আর পরিচালক হোটেলে থাকবেন।

এমিলিয়ার পরনের জামাটি কোমর পর্যন্ত নেমে এল। ইচ্ছে হল কাছে টেনে নিই। কিন্তু স্পর্শ না করে একভাবে চেয়ে রইলাম তাব দিকে—যদি চোখাচুখি হয়ে যায়, তাই বুক কাঁপতে লাগলো।

নাক মুছে মুখে হাসি টেনে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বললো এমিলিয়া—তুমি দেখছি তোমার স্ত্রীর নগ্ন রূপ দেখতে লজ্জা পাও না—অবশ্যি লুকিয়ে লুকিয়ে।

সে তার জামাটা টেনে তুলে বললো, আমি ক্যাপ্রিতে যেতে রাজী আছি, তবে একটা শর্তে—

কোন শর্ত আমি শুনতে চাই না। আমরা যাবো—ব্যস, কোন অছিলায় আমায় ভোলাতে পারবে না—এখন নাও তো—

আমার উক্তিতে প্রকাশ পেল যেন ক্রোধ। তাই হয়তো ভীত হয়েই এমিলিয়া ওখান থেকে চলে এলো।

একাদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রি দ্বীপে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। বাত্তিসতা আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমরা কার বাড়িতে যাচ্ছি—তাঁকে ছাড়া কি যাওয়া যায়? নতুন জায়গা—সব ব্যবস্থা উনি করে দিয়ে আসবেন।

জুন মাসের গোড়ার দিকে নির্মল আকাশ, ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাত্তিসতা রেনগোল্ডের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। আমি আর এমিলিয়া তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলাম।

আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বাত্তিসতা বললেন, এবার বলুন তো, ব্যবস্থাটা কেমন করা যায়? ঠিক আছে আমিই বলছি, মিসেস মলটেনি আমার গাড়িতে যাবেন আর আপনি রেনগোল্ডের সঙ্গে যাবেন। আপনারা যেতে চিত্রনাট্যটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন?

আমি এমিলিয়াকে লক্ষ্য করলাম। তার মুখে ফুটেছে অবজ্ঞা ও উদ্বেগ।

এমিলিয়া এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু বাত্তিসতা তাকে এক প্রকার টানতে টানতে নিয়ে চললেন। জিজ্ঞাসু বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো এমিলিয়া। একবার মনে করলাম, তাকে আমাদের সঙ্গে আসতে বলবো কিনা। কিন্তু বাত্তিসতা রাগ করবেন। কিছু তাই বললাম না।

বাত্তিসতা গাড়ির দরজা খুললাম, এমিলিয়া ভেতরে গিয়ে বসলো। বাত্তিসতা তার পাশে বসলেন। আমি আর রেনগোল্ড আমার গাড়িতে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরের বাত্তিসতার গাড়ি আমাদের পেছনে ফেলে সবেগে নেমে গেল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, তারপর একটি বাঁক ঘুরে মিলিয়ে গেলো।

নগরীর সীমা ছাড়িয়ে এলাম। রেনগোল্ড এবার কথা বললেন—সেদিন বাত্তিসতার দপ্তরে আপনি ভয় পেয়েছিলেন নিশ্চয় ভেবেছিলেন—এমন একটি অসামান্য চিত্রে আপনাকে নামানো হচ্ছে—তাই না?

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললাম, এখনও ভয় পাচ্ছি।

কোন ভয় নেই আপনার। আমরা মনস্তত্ত্বমূলক ছবিই তুলবো। আপনাকে যেমন বলেছি ঠিক তেমনি, আর জানেন মিঃ মলটোন, অন্যান্য চিত্র নির্মাতারা যেমন ভয় করেন তেমন ভয় করি না, আমি চাই, আমার হাতে চলচ্চিত্রের দৃশ্য সজ্জার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। নাহলে ছবি তুলবোই না। এই আমার স্পষ্ট কথা।

আমি তাঁর কথা শুনে খুশী হলাম। মনে ভাবলাম, বাত্তিসতার সঙ্গে কাজ আমাকে নাজেহাল হতে হবে না।

দেখুন মলটেনি, ক্যাপ্রিতে যেতে আপত্তি করিনি। বর্হিদৃশ্যগুলি নেপ্‌লস উপসাগরেই তুলবো—কিন্তু সেটা হবে কেবল পটভূমি—বাকীটার জন্য তো রোম-এ থাকতেই হবে–ইউলিসিস নাটকটি কোন নাবিক, সৈনিক বা আবিস্কারের কাহিনী নয়–এ নাটক সব লোকের জন্য এবং সব কালের জন্য–ইউলিসিসের উপকথার আড়ালে রয়েছে এক জাতের লোকের সত্যিকারের জীবন।

আমি কোন চিন্তা না করেই বললাম, গ্রীক উপকথা মাত্রই মানুষের জীবন নাট্য–কল্পাতীত, স্থানাতীত, চিরন্তন।

আপনি ঠিকই বলছেন মিঃ মলটেনি। প্রতিটি গ্রীক উপকথাই বলতে গেলে, মানব জীবনের আদর্শ রূপক উপকথা গুলির উপর ভিত্তি করে রচিত গ্রীক সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব না হারিয়ে আধুনিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, সম্পূর্ণ স্বাধীন যুগোপযোগী করে রূপায়িত করতে হবে।

আমরা নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। সোনালী ধানের পিঙ্গল পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাত্তিসতার অনেক

পেছনে পড়ে রয়েছি। যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়, শূন্য রাস্তা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

রেনগোল্ড আবার বলতে শুরু করলেন, ও'নীল যদি বুঝতেন, আধুনিকতম মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করতে হবে উপকথা গুলির। বিষয় বস্তুর উপর প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত ছিল তাঁর, প্রয়োজন ছিল নতুন জীবনের অবতারনা। তিনি তা করেন নি, তাই কোন আবেদন নেই তাঁর চিত্রের মধ্যে।

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম—আমার তো মনে হয় এটাই বরং সুন্দর হয়েছে।

আমার কথায় কান না দিয়ে রেনগোল্ড বললেন, এখন "ওডিসি" কে আমরা এমন করতে চলেছি, যা ও'নীল করতে চায়নি বা কখনও কল্পনা করতে পারেন নি। এ শুধু বাহ্যিক ঘটনা, তাতে "ওডিসি" হবে একটি বিরাট অভিযানের চিত্র—বাস্তিসতা যেমন মনে করেন, ঠিক তেমনি, কিন্তু বাস্তিসতা হচ্ছেন চিত্র-নির্মাতা, আপনি তা নন—আপনি জ্ঞানী, রুচিবান, বুদ্ধিমান, মাথা খাটাতে হবে, বুদ্ধিকে কাজে লাগতে হবে আপনাকে।

তাই তো আমি করছি।

না না, আপনি তা করছেন না। সবার আগে খেয়াল করুন, ইউলিসিসের মূল কাহিনী হলো, তাঁর সঙ্গে স্ত্রী পেনিলোপের সম্পর্ক—

আমি কেবল শুনে যেতে লাগলাম। কোন সাড়া দিলাম না।

"ওডিসির" প্রথমেই নজরে পড়ে, ইউলিসিসের বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন, যে দশ বছর সময় লেগেছে তার মধ্যে তাঁর প্রতি পেনিলোপের প্রেম থাকা সত্বেও তিনি বার বার সুযোগ অবহেলা করেছেন, বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন হোমারের মতে, পেনিলোপ ছাড়া আর কোন চিন্তার স্থান ছিল না ইউলিসিসের মনে—তাঁর একমাত্র কামনা ছিল পেনিলোপের সঙ্গে পূর্ণ মিলন, কিন্তু আমরাও কি বিশ্বাস করবো হোমারের এ উক্তি।

দেখুন মলটেনি, একাধিকবার "ওডিসি" পড়ে আমি এই ঠিক পরিকল্পনায় এসে হাজির হয়েছি যে ইউলিসিস নিজের থেকে বাড়ি ফিরে আসতে চাননি। পেনিলোপের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের বাসনা তাঁর ছিল না। আপনারা যে যাই বলুন না কেন—

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

আমার কোন সাড়া না পেয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, সত্যিই ইউলিসিস হচ্ছেন এমন একটি লোক যিনি সত্যিই তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, তার কারণ, ভয়েই মনের অবচেতনার উৎসাহ নিজের যাত্রাপথ দীর্ঘতর করারই এক অপরিজ্ঞাত আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছু নয়।

'ওডিসি'-র এমন ভাষ্য কখনও কল্পনা করিনি। তাই অবাক হয়ে গেলাম—ইউলিসিসের মতো একটি সহজ চরিত্রের এমন জটিল বিশ্লেষণে। মনস্তত্ব নিয়েই কারবার করেছেন রেনগোল্ড। তাই এটা অস্বাভাবিক নয় তাঁর পক্ষে।

আমি নীরস কণ্ঠে বললাম, আপনার কথাটা ঠিক, কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, কেমন করে—

দাঁড়ান, আপনাকে আমি স্পষ্ট করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। "ওডিসি" দাম্পত্য বিরোধেরই কাহিনী। এই দাম্পত্য বিরোধ সম্বন্ধে বহুদিন পরীক্ষা চলেছে, অনেক বিতর্ক হয়েছে। দশ বছর ধরে তিনি যত রকমে সম্ভব বিলম্ব করেন, দাম্পত্য জীবনের ছায়াতলে ফিরে না আসার অনেক অজুহাত দেখান। এমন কি অন্য একজনকে বিয়ে করার কথাও ভেবেছিলেন। অবশেষে আত্ম দমন না করতে পেরে গৃহে ফিরে আসেন।

তবে একটা মনে রাখার চেষ্টা করবেন, ইউলিসিস কোন ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে সংঘটিত দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প নয়—তাতে যা ঘটেছে সবই হলো ইউলিসিসের অবচেতন মনের প্রতীক—আপনি "ফ্রয়েড" পড়েছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ, কিছুটা পড়েছি।

বেশ! ঐ "ফ্রয়েড" ই হবে ইউলিসিসের মনোরাজ্যের পথ প্রদর্শক। ভূমধ্যসাগরের পরিবর্তে আমরা দেখবো ইউলিসিসের অন্তর্জগৎ বা অবচেতনা।

আমরা ক্যাপ্রিতে গিয়ে এ ব্যাপারে আবার শান্ত মস্তিষ্কে আলোচনা করবো। মোটর চালানো ও "ওডিসি" সম্বন্ধে আলোচনা একসঙ্গে হয় না মিঃ মলটেনি। আপনি বরং মন দিয়ে গাড়ী চালান, আমি বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।

প্রায় ঘণ্টা খানেক চুপ করে রইলাম। শান্ত সমুদ্রের পাশ দিয়ে রাস্তা। অবসন্ন ভাবে ঢেউ উঠছে। হলদে ও কালো বালির পাহাড়ের পরেই আবছা সবুজ জলরাশি। আরও দূরে সমুদ্র গতিশীল কিন্তু নিস্তরঙ্গ। আকাশেও তেমনি অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। অনন্ত নীল আকাশ জ্বলজ্বল করছে, সাদা মেঘ ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামুদ্রিক পাখিরা ঘুরছে।

সমুদ্রের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে গাড়ী চালাচ্ছিলাম। উজ্জ্বল নীল আকাশ তলে এই বর্ণাঢ্য সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গরাজির মধ্যে, ভূমধ্য-সাগরের বুকে অজ্ঞাত অপরিচিত রাজ্য সন্ধানী ইউলিসিসের অর্ণব-পোত কল্পনা করা সহজ। এখানে সবই রয়েছে। রেনগোল্ডের কাছে ওডিসি মনস্তত্বের অসঙ্গতির মধ্যে জড়িত একটি আধুনিক মানুষের অন্তর্রাজ্যের নাটক। মনে মনে চিন্তা করলাম, এর চেয়ে নিকৃষ্ট চিত্র নাট্যচিন্তা করা যায় না।

রাস্তার ধারে বালুকাময় ক্ষেত্রে অজস্র আঙ্গুর গাছের সবুজ শীষ দেখা যাচ্ছে। তার পরে খানিকটা খেলা ভূমি। সেখানে জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে।

আমার মনে আনন্দ জেগে উঠলো। বললাম, দেখুন রেনগোল্ড। এবার একটু হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে ভালো হত।

গাড়ি থামালাম। আঙুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে

অগ্রসর হলাম। বললাম, চলুন, একবার সমুদ্রের তীরে গিয়ে বসি।
রেনগোল্ড নির্বিকারে আমার পেছু পেছু হাঁটতে লাগলেন।—দেখুন আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা পরিস্কার বলতে পারিনি আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে বলতে পারি।
হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন না।
দেখুন সবটা বিশ্বাস করতে পারছি না, আবার আপনার ব্যাখ্যাকেও অবিশ্বাস করছি না। আমি বলতে চাই, ওডিসির প্রকৃত সৌন্দর্য হলো—প্রত্যক্ষ বাস্তবের ওপর বিশ্বাস। তাতে কোন ভাষ্য বা বিশ্লেষণের স্থান নেই।
সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে বললাম—যখন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে, হোমার হলেন সেই যুগের লোক। দৃশ্যমান জগতের সত্যকে খালি চোখে না দেখে তাই এঁকে গেছেন তিনি। এর তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা না করে হুবহু যেমন রয়েছে ঠিক তেমনটিই নেওয়া উচিত।
রেনগোল্ড হো হো করে হেসে উঠলেন, সে হাসিতে ফুটে উঠলো বিজয় অহঙ্কার। বললেন, আপনার দৃষ্টি সম্পূর্ণ বর্হিমুখী, যাদের অন্তর্মূখী দৃষ্টি তাদের আপনি বুঝতে পারেন না। অবশ্য তাতে কেনে ক্ষতি হবে না, আপনার বর্হিমুখীতা আমার অন্তমুর্খিতার সমতা রক্ষা করবে, দেখবেন, আমরা দুজনে মিলে করবো এক অত্যাশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি।
আমি রেনগোল্ডের কথায় বিব্রত বোধ করলাম। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—রেনগোল্ড, মলটেনি, আপনারা এখানে কি করছেন? হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি?
পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, বাত্তিসতা আর এমিলিয়া। বাত্তিসতার সর্বাঙ্গে উল্লাসের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আর এমিলিয়াকে বিব্রত, অতৃপ্ত ও চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে।

বাত্তিসতা বললেন, আমরা অনেক ঘুরে এলাম। রোমের একটা জায়গা দেখিয়ে এনেছি আপনার স্ত্রীকে মিঃ মলটেনি। সেখানে আমার একটা বাড়ি হচ্ছে। আচ্ছা, রেনগোল্ড, ওডিসি সম্বন্ধে আলোচনা করছেন তো আপনারা ?

রেনগোল্ড ছোট্ট করে উত্তর দিলেন—যেন তিনি বাত্তিসতার উপস্থিতি পছন্দ করছেন না।

কিছুটা দূরে এমিলিয়া দাঁড়িয়েছিল। আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বাত্তিসতা বললেন, বলুন মহাশয়া, আমাদের লাঞ্চটা কোথায় হবে—নেপলস-এ না ফর্মিয়ায় ?

এমিলিয়া প্রথমে চমকে উঠলো। আপনারাই ঠিক করুন না। আমার কোন আপত্তি নেই।

তবুও বাত্তিসতা কোন কথা শুনলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর এমিলিয়া বললো, তাহলে নেপলস্-এ হবে। এখনও আমার খিদে পায় নি।

উল্লাসের সঙ্গে বাত্তিসতা বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। চলুন, এবার খাওয়া যাক।

বাত্তিসতা আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। এমিলিয়া কিন্তু এক পাও হাঁটলো না। আমি এগিয়ে আসতেই নীচু স্বরে বললো আমি এবার তোমার গাড়িতেই আসছি, লক্ষীটি, বারণ করো না। বাত্তিসতা ভীষণ জোরে গাড়ী চালান।

আমি তার কথার ভঙ্গীতে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে এমিলিয়া আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। আগেই বাত্তিসতা নিজের গাড়ির দরজা খুলে রেখেছিলেন। তিনি এমিলিয়াকে আমার গাড়ীতে উঠতে দেখে আপত্তি জানালেন।

গাড়ী থেকে নেমে এসে বললেন দেখুন মিসেস মলটেনি, আপনি তো ক্যাপ্রিতে গিয়ে আপানার স্বামীর সঙ্গে দুমাস থাকবেন, গলার স্বর নীচু পর্দায় নামিয়ে বললেন, আর আমি রেনগোল্ডের সঙ্গে রোমে

অনেকদিন কাটিয়েছি। ওর মতো লোকের সঙ্গে থাকা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার। আর, আপনার স্বামী নিশ্চয়ই আপত্তি করছেন না —কি বলেন, মলটেনি?

আমি অনিচ্ছা সত্বে বললাম, না, তবে এমিলিয়া বলছিল, আপনি ভীষণ জোরে গাড়ি চালান'।

উৎফুল্ল হলেন বাত্তিসতা।—ঠিক আছে, আমি এখন থেকে এত আস্তে গাড়ী চালাবো যে মনে হবে পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। আর রেনগোল্ডের মুখে ফিল্ম ছাড়া অন্য কোন কথা নেই।

আমি একটুও না ভেবে বললাম, এসো এমিলিয়া, তুমি মিঃ বাত্তিসতার জন্য এইটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পার না।

এমিলিয়া আমার দিকে একবার তাকালো। তার চাউনির অর্থ আমি পড়তে পারলাম না। বললো, বেশ আসুন।

বাত্তিসতা আর এমিলিয়া পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। এমিলিয়া ধীর আলস্য ভরা পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। যে আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে সে দাঁড়িয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন তার মূর্তিটা গড়া।

মনে হয়, এমিলিয়া খুশী নয়। কী বুদ্ধু আমি? হয়তো সে আমার সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল, আমায় বলতে চেয়েছিল, তোমায় ভালোবাসি। আর, আমি? আমি তাকে বাত্তিসতার সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছি।

হাত তুলে ডাকতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষনে দেরী হয়ে গেছে। সে বাত্তিসতার সঙ্গে গাড়িতে উঠছে।

বাত্তিসতার গাড়ী চললো, অনেকদূর ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

রেনগোল্ড হয়তো আমার মনের উৎকণ্ঠা বুঝতে পেরেছিলেন। ভেবেছিলাম, তিনি আমার চিত্রনাট্য নিয়ে গল্প করবেন। কিন্তু না, তিনি চোখের ওপর টুপিটা টেনে নিয়ে চুপ করে বসলেন। একসময়ে

ঘুমিয়ে পড়লেন।
আমি দ্রুতগতিতে নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগলাম। সমুদ্র পেছনে ফেলে মিষ্টি রোদ মাখা সবুজ স্নিগ্ধ গ্রামাঞ্চলে এসে হাজির হয়েছি। চারিদিকে ছায়া ভরা মায়াময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
কিন্তু এত সুন্দর দৃশ্যগুলি আমি দেখে দেখতে পেলাম না। সম্পূর্ণ মন তিক্ততায় ভরে গেল। এমিলিয়াকে কেন যেতে দিলাম, কারণ কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। মনটা ভার হয়ে রইল।
নেপলস-এর কাছাকাছি আসতেই দৃশ্যাবলীর রঙ পরিবর্তন হল। সমুদ্রের দিকে রাস্তাটা বেঁকে গেছে, আমরা পাহাড়ের নীচ দিয়ে এগোচ্ছি, পাইন গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে উপসাগরের উজ্জ্বল নীল জল দৃষ্টিতে পড়ছে।
মন আসন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সমস্ত শরীর ও মন কেঁপে উঠলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কিছুই।

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রিতে এসে রেনগোল্ডকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আমরা তিনজন একটা সরু গলি বেয়ে বাগান বাড়ির দিকে এগোলাম। আমরা অবশেষে পাহাড়ের ধারে এসে হাজির হলাম। সূর্য পাটে বসেছে, রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। বাত্তিসতা আর এমিলিয়া রয়েছে আগে, আমি পেছনে, মুগ্ধ বিস্ময়ে নিসর্গ শোভা উপভোগ করছি। কিছুটা প্রকৃতিস্থ বোধ করলাম।
রাস্তাটা পেরিয়ে একটা সরু রাস্তায় আসতেই এমিলিয়ার আনন্দের সঙ্কেত পেলাম, কারণ এর আগে ও এখানে আসেনি। এখান থেকে সমুদ্রের উপর দুটি লাল পাহাড় বড়ই অদ্ভুত, মনে হয়, আয়নার ওপর

ছুটি তারা খসে পড়েছে আকাশ থেকে।

আমি তাকে বললাম, জানো এখানে এক ধরণের নীল টিকটিকি আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এদের দেখা যায় না। কারণ ওরা নীল পাহাড়ে ও সমুদ্রের মাঝখানে থাকতে ভালবাসে।

এমিলিয়া এখন মন দিয়ে শুনছিলো আমার কথা যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল তার বিদ্বেষে ভাব। আমারও মনে তখন জেগে উঠলো নতুন আশা পবিত্র নীল আলোক ফুটে উঠবে অন্তরে। চিকচিকে সমুদ্র ও আকাশের মতো উজ্জ্বল, আনন্দময় এবং নির্মল হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

পাহাড়ের অদূরেই সাদা প্রাসাদের সমুদ্রের উপর ঝোলানো বারান্দা দেখতে পেলাম, এটাই বাত্তিসতার বাগান বাড়ি। বাত্তিসতা আমাদের আগে চললেন, বললেন, বাড়িটা পেয়েছি একজনের কাছে টাকা পেতাম তার পরিবর্তে। আসুন, একবার সব ঘরগুলো দেখে নিয়ে বিশ্রাম নেবেন।

বাত্তিসতাকে অনুসরণ করে হাঁটলাম, পরিপাটি করে তিনি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। শোবার ঘরে ফুলদানিতে ফুল সাজানোর, রান্না ঘরে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। আজ যেন তার বাড়ীতে উৎসব।

ফিরে এসে বসলাম। হঠাৎ বিনা ভূমিকায় বাত্তিসতা প্রশ্ন করলেন, দেখুন মলটেনি, রেনগোল্ড সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কতটুকুই বা দেখেছি তাঁকে। কেমন করে বলবো। তবে মনে হয় খুব বেশী সীরিয়াস—সবাই তাঁর সুনাম করে চিত্রনাট্য নির্দেশক হিসাবে।

খানিক কি ভেবে নিয়ে বাত্তিসতা বললেন, আমিও তাঁকে ভালো করে জানি না। তাছাড়া উনি হচ্ছেন জার্মান আর আমরা দু'জন ইতালীয়। আমাদের অনুভূতি ও জীবনবোধ স্বতন্ত্র।

আমি কোন সাড়া না দিয়ে চুপ করে শুনতে লাগলাম।

জার্মান রেনগোল্ডের সঙ্গে আপনাকে রাখতে চাই এই কারণে,

আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। তাই স্থির করেছি, যাবার আগে, আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যাবো।

এই ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনা-কালীন আমি সব করেছি, রেনগোল্ড আমার সঙ্গে হয় এক মত হন কিংবা নীরব থাকেন, নিজে কিছু বলেন না। তাঁর মতে, চুপ করে থাকলেই সহজে বোকা বানানো যায়, কিন্তু আসলে আমি খুব সাবধানী—একথা ভুললে চলবে না।

তার মানে, আমি রেনগোল্ডকে বিশ্বাস করেন না?

বিশ্বাস করি আবার করি না। শিল্পী ও ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর উপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভরসা রাখতে পারিনা তাঁর ওপর। পরিস্কার করে কথাটা বলি, আমি চাই হোমরের 'ওডিসি'র মতো একটা ফিল্ম। হোমর যেমন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন অভিনব একটি কাহিনী—দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। আমি ও সেই রকমই চাই। হোমর তাঁর কাহিনীর মধ্যে দানব, অলৌকিক ঘটনা, ঝড়, ডাইনী ও চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারনা করেছেন, আপনিও তাই করুন।

আপনি হয়তো মনে করছেন আমি একটা বোকা। যদি সেই আশা পোষণ করেন, তাহলে ভুল করবেন, বুঝলেন?

আমি ধীর কণ্ঠে বললাম—আপনি এ কথা মনে জায়গা দিচ্ছেন কেন যে আপনাকে আমি নির্বোধ মনে করি?

আপনাদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বাত্তিসতা একটু শান্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—সেদিনের কথা আপনার মনে পড়ে, সেদিন আমার অফিসে প্রথম রেনগোল্ডের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল। সেদিন আপনি বলেছিলেন। আচ্ছা, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, তিনি একটি মনস্তত্ত্বমূলক ছবি তুলবেন—ইউলিসিস ও পেনিলোপের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে—না?

অবাক কাণ্ড। বাত্তিসতাকে যেমন ভেবেছিলাম তেমন নন। বললাম, হ্যাঁ, ঐ ধরণের একটা কিছু বলেছিলেন হয়তো।
বেশ, এখন দেখছি, চিত্রনাট্য তৈরী হয়নি, আপনাকে তাই জানাচ্ছি আধুনিক কালের কোন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে চিত্র নির্মাণ করতে চাই না। তাহলে আর হোমর ওডিসি নিয়ে মাথা ব্যথা করতাম না? 'ওডিসি' হচ্ছে শুধু একটি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী এ সম্বন্ধে যাতে আপনাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে, সেজন্য বলছি, আমি চাই সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটা ছবি।
আপনার কথা মতই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।
আমি সন্দেহ করছি না, সবই খুলে বললাম আপনাকে। কাল সকালেই কাজ আরম্ভ করুন আপনি। আপনার নিজেরই স্বার্থে সময় থাকতে সতর্ক করে দিলাম শুধু। রেনগোল্ডের কাছে আপনিই হবেন আমার মুখপাত্র। প্রয়োজন হলে আপনিই তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন। আমি চাই, 'ওডিসির' কাব্যে যেমনটি থাকবে, আমার চিত্রে ঠিক তেমনিই থাকবে।
আমি মুখে হাসি এনে বললাম, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, মিঃ বাত্তিসতা, হোমরের সবটুকু কাব্যই আপনি পাবেন—তাঁর মধ্যে যতটুকু খুঁজে পাই সবই।
বাত্তিসতা উৎফুল্ল হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমায় একা রেখে বেরিয়ে গেলেন।
বাত্তিসতার কথায় উত্তেজিত বোধ করলাম, তাঁর কথায় টের পেলাম, অর্থের জন্য আমি যে কাজটি নিরুদ্বেগে গ্রহণ করেছি, সেটি কত কঠিন। চিত্রনাট্যটি লিখতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। ভেবে আৎকে উঠলাম। কেন এ অন্যায় কাজ আমি করতে যাবো? রেনগোল্ড ও আমার মধ্যে যে আলোচনা হবে তা গোপন রাখবো কেন? কেন আপোষে মীমাংসার চেষ্টা করবো? কেনর উত্তর আমি খুঁজে পেলাম।

যে ক্যাপ্রি খানিক আগে পরম রমণীয় ও শোভনীয় মনে হয়েছিল আমার কাছে, এখন আমার মতো শিক্ষিত রুচিবান ব্যক্তির মনের চাহিদার সঙ্গে চিত্র-নির্মাতার চাহিদার সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে তা বদলে গেল, বাত্তিসতা প্রভু আর আমি চাকর। প্রভুর কর্তৃত্ব এড়াবার জন্য শঠতা বা ছলনার আশ্রয় নেওয়া আরও বেশী অসম্মানকর। আসল কথা, চুক্তিপত্রে সই করে আমি আমার মনটা বিকিয়ে দিয়েছি এক শয়তানের কাছে। কড়ায় গণ্ডায় তার সবটুকু আদায় করে তবেই ছাড়বে। পরিস্কার করে বলেছেন বাত্তিসতা, টাকাটা আমিই দিচ্ছি।
কথাকটা বারবার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। বাত্তি-সতার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা জাগলো। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো, জানলাটা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ালাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমস্ত ছাদটা মৃদু চাঁদের আলোয় ভরে আছে। বড় ছাদ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে একটা সিঁড়ি। মনে হল, একবার নিচে নেমে বেড়াই। কিন্তু এখন আর সময় নেই। ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।
নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে দ্বীপের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু, কালো পাহাড়গুলি। নিচের পাহাড় উপরের পাহাড়গুলির চেয়ে আবছা। দিগন্তে সীমাহীন অন্ধকার, অনন্ত নীরবতা বিরাজ করছে। দিগন্তের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। দূরে বাতিঘরে ক্ষীণ আলো নজরে পড়লো। এ ছাড়া আর কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই চারদিকে।
নীরব রাত্রির প্রভাবে মন ক্রমশঃ শান্ত হয়ে উঠছিল। পৃথিবীর

সবটুকু সৌন্দর্য এই অনন্ত বেদনার পথে ক্ষনিকের বাধা সৃষ্টি করতে পারে হয়তো, কিন্তু আমার দুঃখের তিমির রাত্রির অবসান কখনও হবে না।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ এমিলিয়ার অবাঞ্ছিত চিন্তা মনে পড়ল। বাত্তিসতা ও রেনগোল্ডের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে আমার, আমি রয়েছি হোমরের কাব্য বর্ণিত একটি স্থানে। তাই 'ওডিসি চিত্রনাট্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেল মন। বার বার পড়ে ও মনে মনে আবৃত্তি করে মুখস্থ হয়ে গেছে পেনিলোপের সেই উক্তি—

আমার উপর রাগ করো না, ইউলিসিস—তোমার প্রতিটি কাজেই তো তুমি বিজ্ঞতার পরিচয় দাও। আমাদের এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী দেবতারা। তাঁদের ইচ্ছা ছিল না যে আমাদের যৌবনের স্বপ্নরাঙা দিনগুলি মিলনের মধুর আনন্দে কেটে যাক, কিন্তু আমরা যথারীতি দেখি জরায় শুভ্র হয়ে গেছে দুজনের কেশদাম, তবু প্রেম বন্ধন এতটুকু শিথিল হয়নি অমলিন রয়েছে আমাদের প্রেম—

অনুবাদে হোমরের ভাষায় অবিকল ধ্বনি মাধুর্য না থাকলেও এই উক্তির মধ্যে যে আবেগ রয়েছে তাতেই যথেষ্ট আনন্দ পেতাম অংশটি পড়ে। হায়, যদি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আশা থাকতো! কেন? মনে হলো—বাগান বাড়ির যে কক্ষে এমিলিয়া রয়েছে সেখান থেকেই আমি এর উত্তর পাবো।

সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে জানলার কাছে গেলাম, দাঁড়িয়ে রইলাম ছাদের এক কোণে। সেখান থেকে খাবার ঘরের ভেতরটা দেখা যায়, অথচ ভেতর থেকে বাইরের কিছু দেখা যায় না।

লক্ষ্য করলাম, এমিলিয়া বাত্তিসতার সঙ্গে সে ঘরে রয়েছে। উপুড় হয়ে একটি কাচের গেলাসে সরবত তৈরী করছেন বাত্তিসতা। এমি-লিয়ার চোখে উদ্বিগ্ন উদ্ধত দৃষ্টি। সে যেন বত্তিসতার হাত থেকে গেলাসটা নিতে চায়। তারপর বাত্তিসতা একটি গেলাস এমিলিয়ার

দিকে বাড়িয়ে দিলেন। প্রথমে সে একটু চমকে উঠেছিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে গেলাসটা নিল।

যা মনে মনে চিন্তা করেছিলাম তাই হল। ঘরের মাঝখানে এসে এমিলিয়ার মুখের কাছে নিজের মুখ আনলেন বাত্তিসতা। বাত্তিসতা ঘাড় নাড়লেন, আরো কাছে তাকে টেনে নিলেন। চুমু, না খেয়ে একটানে এমিলিয়ার গায়ের জামাটি ছিঁড়ে ফেললেন। এমিলিয়ার নগ্ন কাঁধে বাত্তিসতার মাথাটি নেমে এলো। এমিলিয়া নিশ্চল—যে যেন শেষ পর্বের প্রত্যাশায় রয়েছে।

হঠাৎ জানালার দিকে লক্ষ্য পড়লো তার। আমাকে দেখতে পেল যেন, অবজ্ঞা সূচক ভঙ্গি করে এক হাতে জামাটা চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতগতিতে।

আমি আর স্থির হয়ে না দাঁড়িয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগলাম। হতবাক হয়ে গেলাম, না জানি, যা মনে করেছি, এ যেন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমি আজ সত্য উদ্ধার করেছি। আবিস্কার করেছি এমিলিয়ার বিশ্বাস-ঘাতকতা। ছাদের ধারে থামের দিকে আসতেই অসহ্য বেদনা জাগলো মনে। না না না, যা দেখেছি তা সত্য নয়—সত্য হতে পারে না। অব্যাহত আছে আমার পূর্ব অধিকার। না, আমি ভুল করেছি। সে অবিশ্বাসিনী নয়, বিশ্বাসঘাতকতার মূল এখনোও রয়েছে অনাবিস্কৃত—

মনে পড়লো—বাত্তিসতার প্রতি সর্বদাই অব্যক্ত ঘৃণার ভাব দেখিয়েছে এমিলিয়া। নিঃসন্দেহে এই প্রথম চুম্বন। এমিলিয়াকে একা পেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন বাত্তিসতা। সুতরাং এখনও যথেষ্ট সময় আছে। জানতে হবে—কেন বাত্তিসতাকে চুমো খেতে দিল এমিলিয়া? বার বার মনে হলো—সেই চুম্বন সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্ক রয়েছে অপরিবর্তিত। তবে—আগের মতো আমাকে ভাল না বাসার বা ঘৃনা করার অধিকার রয়েছে এমিলিয়ার।

ঝড়ের বেগের মতো এসব চিন্তার উদয় হলো আমার মনে। অন্ধ-

কারের মধ্যে একভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বুঝলাম, মনের চিন্তা ও আবেগ আর নেই। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জানালার কাছে এসে জানালা খুলে খাবার ঘরে নেমে এলাম। দেখলাম—বাত্তিসতা আর এমিলিয়া খেতে বসেছে। এমিলিয়া ছেঁড়া জামাটা পাল্টে ফেলেছে। তার বিশ্বাসঘাতকতার এই মর্মান্তিক জাজ্জল্যমান প্রমাণ পেয়ে আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম।

আমায় দেখে বাত্তিসতা আনন্দের সঙ্গে বললেন—আরে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

আমার দিকে একবার-চোখ তুলে চেয়ে এমিলিয়া চোখ নামালো। ছাদের ওপর থেকে আমি যে তাদের লক্ষ্য করেছি সেটা সে দেখেছে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

চুপচাপ নিজের মনে খেয়ে চলেছে এমিলিয়া। আমার ধারনা ছিল, সে ছলনা জানে না। আজ তা মিথ্যা হয়ে গেল।

মনের নিদারুন স্ফূর্তি গোপন না রেখে বিজয়ীর উল্লাসে অনর্গল বকে যাচ্ছেন, খাচ্ছেন, সুরা পান করছেন বাত্তিসতা। ভদ্রলোকের আমিত্ব গর্ব দেখে মনে হচ্ছে—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এমিলিয়াকে জয় করেছেন তিনি। পরিহাসের মাধ্যমেই তিনি তাঁর গর্ব প্রকাশ করেছেন। মনে হলো যা দেখেছি তা সত্বেও এমিলিয়া যেন তাঁর উপর বিরূপ। না না আমারই যেন ভুল। লক্ষ্য করলাম, যখনই বাত্তিসতা কথা বলছেন তখন কামাত না হলেও কৌতুহলী, বিস্ময়াকুল, ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠছে এমিলিয়ার দৃষ্টি। মনে পড়ে গেল এরকম আর একটা চাউনি আমি দেখেছি। অনেকদিন আগে ফিল্ম ডিরেকটার পাসেত্তির

বাড়িতে যখন লাঞ্চ করছিলাম তখন তাঁর স্ত্রীর, চোখে ওরকম দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিলাম। এমিলিয়া ও বাত্তিসতাকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখে যতটুকু মনঃকষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশী বেদনা অনুভব করতে লাগলাম।

বাত্তিসতা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের অবস্থা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ তিনি প্রথম বললেন, কী হয়েছে মালটেনি? ক্যাপ্রিতে এসে কি আপনি খুশী হননি? আপনাকে ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

বললাম, ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম—তখন থেকে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেছে অকারনে।

এমিলিয়ার দিকে তাকালাম। তারও মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। তারা দুজনেই নিঃসন্দিগ্ধ। হঠাৎ বলে ফেললাম—আপনাকে একটা কথা বলবো?

নিশ্চয় নিশ্চয়। বলুন—আমি সব সময় সহজ স্পষ্ট কথাই পছন্দ করি?

দেখুন, যখন সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল, আমি নিজেরই স্বার্থে এখানে এসেছি—আপনি তো জানেন আমার জীবনের আশা—রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক লেখা। তাই মনে করেছিলাম, আমার কাজের পক্ষে প্রশান্ত হবে এ জায়গাটি, এখানে সৌন্দর্য, নীরবতা ও শান্তি সবই রয়েছে—আর সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী। কোন চিন্তা নেই। তারপর মনে হলো—এই রমণীর জায়গায় এসেছি নিজের জন্য নয়, এসেছি একটি ফরমায়েসি চিত্রনাট্য লিখতে। জানি এসব কথা আপনাকে বলা উচিত নয়। তবু আপনি জানতে চেয়েছেন বলেই বলছি। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আমার মন খারাপের কারনটা কী?

কিন্তু একি? আমি এ বলতে চাইনি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আচরনের কথা না বলে এগুলো বললাম কেন? বুঝলাম মনের

দুর্বলতা, আমার এই অশুভ ভূমিকায় ওরা কেউই কোন অস্তিত্বের ভাব দেখালেন না।

গম্ভীর ভাবে বাত্তিসতা বললেন, আমি জানি মলটেনি, অনবদ্য চিত্রনাট্যই লিখবেন আপনি।

দেখুন, আমি পেশাদার চিত্রনাট্য রচয়িতা নই। আমার জীবনে একটিমাত্র আদর্শ রয়েছে। তা হলো রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক রচনা। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যে কেউ তার ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারে না। কারণ টাকার প্রশ্নটাই তখন বড় হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে, অস্তিত্বে উচ্চাশায়, এমন কি যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে সম্পর্কেও সর্বাগ্রে টাকার প্রশ্ন আসে।

বুঝলাম, আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে বাত্তিসতা মাথা ঘামান না। তিনি বললেন, দেখুন মলটেনি, আপনার কথা শুনে আমার মনে পড়ে সে সময়কার কথা। যখন আমার বয়স আপনার মত ছিল। একটা আদর্শও ছিল, কিন্তু আদর্শটা কি সেটা জানা ছিল না। তারপরে একজনের সঙ্গে দেখা হলো, তিনি আমায় কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমিও ঠিক আপনার মত তাতে বলেছিলাম। আমি তাঁর উপদেশ পালন করে বলে ছিলাম। "যতক্ষন পর্যন্ত না কেউ জানতে পারে—সত্যিই সে কী চায়, ততক্ষন কোন আদর্শের কথা চিন্তা না করাই ভালো—নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শকে স্মরণ করে—পালন করা দরকার। আপনিও আপনার আদর্শানুযায়ী নাটক লিখুন।

জানেন মলটেনি, সাফল্যের গুপ্ত মন্ত্র কী, ষ্টেশনে বুকিং অফিসের সামনে সকলকেই টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। পালানুক্রমে যে যেখানে যায় সেখানের টিকিট হাতে পায়। আপনিও অনেক দূর দেশের টিকিট পেতে পারেন, আমেরিকা কেমন হয়? তবে হ্যাঁ, ঠিক তেমনি করে জীবনেও লাইনে দাঁড়াতে হবে, বুঝলেন তো এবার।

মুখ টিপে বাত্তিসতা হাসলেন। এমিলিয়ার ঠোঁটেও ম্লান হাসি ফুটে উঠল। মিসেস পাসেত্তির দৃষ্টি নতুন করে দেখতে লাগলাম তার চোখে। দুর্বিসহ মর্ম বেদনার তলে হারিয়ে গেল আমার ঈর্ষা বিষাদে ভরে উঠলো সারা হৃদয়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ডিনার শেষ হলো। বাত্তিসতার কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনার পর আমাকে যেন মনে পড়লো এমিলিয়ার।

এমিলিয়া কিছু না বলে হঠাৎ বিদায় নিল। বাত্তিসতাকে সন্তুষ্ট ও উৎফুল্ল দেখালো। এমিলিয়ার মনে তিনি যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চান —এ যেন তারই ইঙ্গিত। কিন্তু আমার অধীরতা আরো দ্বিগুণ বাড়লো। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ঘুমোবার অজুহাতে বাত্তিসতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এমিলিয়ার ঘরের দরজায় টোকা মারতেই আমায় সে ভেতরে ডাকলো। বিরক্ত ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, বলতো আমার কাছ থেকে তুমি আর কী চাও?

কিছুই না, এসেছি, তোমার কাছ থেকে রাত্রির জন্য বিদায় নিতে।

না, জানতে চাও, আজ সন্ধ্যায় বাত্তিসতার সঙ্গে তোমার আলোচনা সম্বন্ধে আমার মত কি। শোন, তোমার কথাবার্তা কেবল যে সময়োচিত হয়নি এমন নয়, হাস্যকরও হয়েছে।

আমি তোমায় বুঝতে পারি না, চিত্রনাট্য লিখে টাকা পাচ্ছ, অথচ বলছ, তোমার ভালো লাগে না এ কাজ। আজ ভদ্রতার খাতিরে বাত্তিসতা কিছু না বললেও কাল তিনি ভাববেন এ সম্বন্ধে, দেখবেন—যাতে তোমায় আর কাজ না দেওয়া হয়।

একবার ভাবলাম চুপ করে থাকি। কিন্তু তার অবজ্ঞা মাখা কণ্ঠস্বর শুনে ভেবে পেলাম না কি বলবো–তবে এটা জেনো, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। তাছাড়া, এও ঠিক নয় যে আমি এ কাজই করবো।

আলবাৎ করবে।

আমি এতটা অপমান তার কাছে থেকে আশা করিনি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিলাম।—নাও করতে পারি। তবে আজকের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার ফলে হয়তো কাল সকালেই জানিয়ে দিতে হবে--কাজ ছেড়ে দিলাম।

আমি ইচ্ছে করেই কথাগুলো বললাম। আমায় যেমন সে ব্যথা দিয়েছে, তেমনি আমিও তাকে ব্যথা দিতে চাইলাম।

কিন্তু, কি ঘটনা, খুলেই বল না।

ওকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম—ফিল্ম সংক্রান্ত ঘটনা। ও সব ভালো লাগবে না তোমার।

তাই হবে হয়তো, তবে, কাজ ছাড়বার সাহস নেই তোমার—ঠিক কাজ করে যাবে।

ও কথা ভাবছো কেন?

কারণ, আমি তোমায় জানি, মুখেই বল বারবার, আবার সেই চিত্র-নাট্য সম্পাদনার সব অসুবিধেই দূর হয়ে যায় অবশেষে।

হতে পারে, তবে অসুবিধাটা চিত্রনাট্যে নয়। অসুবিধা হলো ব্যক্তিগত। আর এর মানেটা তুমি ভালো করেই জানো। ডিনারের টেবিলেই তো বলেছি, অপরের জন্য কাজ করতে পারছি না আমি, নিজের জন্য কাজ করতে চাই।

কে বারণ করেছে তোমায়?

তুমি, তবে প্রত্যক্ষভাবে না, আমার জীবনে তোমার উপস্থিতি, আমাদের বর্তমান সম্পর্ক তোমাকে প্রথমেই জানিয়েছি, তুমি আমার স্ত্রী, তোমার জন্য সব করছি। যাক ও সব কথা, এখন একটি প্রস্তাব

করবো তোমার কাছে।

কি প্রস্তাব, শুনি?

তোমার কি মত এ সম্বন্ধে। তুমি যা বলবে তাই। বারণ করলে, বাত্তিসতাকে কাল জানিয়ে দিয়ে প্রথম ষ্টীমারেই ক্যাপ্রি ছেড়ে চলে যাবো।

এমিলিয়া খানিক চুপ করে থেকে বললো, তুমি ভীষণ চালাক। কারণ পরে কোন অসুবিধা হলে যেন বলতে পার—দোষ আমারই।

না, আমি নিজেই তো তোমার মত চাইছি।

এমিলিয়া তারপর চুপ করে রইলো। আমি তার মতের প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

আমি বলবো, একবার যখন কাজটি নিয়েছ তখন ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এমিলিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে বলল, উঃ, তুমি আমায় ভীষণ বিরক্ত করছো। তুমি তোমার যা খুশী করতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি আমায় রেহাই দাও।

ভীষণ মনে ব্যথা পেলাম। বললাম, আর কেন এমিলিয়া, কেন আমাদের এই বিরোধ?

সে অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, হয়তো, জীবনই এমনি।

আমি নিশ্চল হয়ে গেলাম। ইচ্ছা হলো বলি, আমি তাকে বাত্তিসতার সঙ্গে দেখেছি, তার মতামত জানতে চেয়ে তাকে কেবল পরীক্ষা করছিলাম। আমাদের প্রশ্নের সমাধান হয়নি এখনও। কিন্তু বলা হলো না আসল কথাটি।

আমি ভীত কণ্ঠে বললাম, যতদিন ক্যাপ্রিতে থাকবো ততদিন তো আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবো আর তুমি একা-একা থাকবে কি করে?

কেন, বেড়াবো, সাঁতার কাঁটবো, সবাই যেমন করে। ভালই লাগবে, অনেক কিছু ভাববারও আছে আমার।

আমার কথা এখনও ভাব ?

এমিলিয়ার হাতখানি টেনে নিয়ে বললাম—কি ভাবী ?

ঝাঁকুনি দিয়ে সে হাতটা টেনে নিল—বলেছি সে কথা অনেকবার। দেখ, এবার ঘুমোও গিয়ে—আমি জানি, তুমি কতগুলো জিনিষ পছন্দ কর না। তা স্বাভাবিকও, তাছাড়া আগে যা বলেছি, সে কথা বার-বার বলতে ভাল লাগে না। ক্যাপ্রিতে এসেছি বলে আমার মত তো আর পরিবর্তিত হয়ে যায়নি।

এমিলিয়ার চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো—তুমি কি মনে কর তোমার চেয়ে আমিই বেশি অপছন্দ করিও সব।

তার কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাষ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি কেবল তোমারই কথা ভাবি, চিরদিনই ভাববো—যাই ঘটুক না কেন—

শেষের কথাগুলো বলে বুঝতে চাইলাম—এমিলিয়ার সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতকতাও ক্ষমা করেছি আমি।

এমিলিয়া আর কোন জবাব দিল না। অবস্থা বুঝে তার কাছ থেকে রাত্রির জন্য বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তালায় চাবি লাগানের আওয়াজ হলো।

তীব্রতর নতুনতর···হয়ে উঠলো আমার মনের যন্ত্রনা।

ষোড়শ অধ্যায়

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কারোর কোন খোঁজ না করেই ঘর থেকে বেরোলাম, না—পালালাম। সারারাত্রি বিশ্রামের পর অবিশ্বাস্য মনে হলো আগের দিনের ঘটনা ও আমার আচরণ। অসম্ভব—সবই অসম্ভব, মিথ্যা। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলা উচিত হবে না। ঘর ছাড়লাম তাই।

রেনগোল্ডের হোটেলে এসে দেখলাম, তিনি পথের শেষপ্রান্তে স্নিগ্ধ

রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্র ও আকাশের বাধাহীন আলো-মাখা একটি অপ্রশস্ত প্রাচীরের সামনে কয়েকটি চেয়ার ও টেবিলের মাঝখানে কাগজ ও কলম নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আচ্ছা, মিঃ মলটেনি, এমন সকাল, কেমন লাগে আপনার ?

চমৎকার।

প্রাচীরটা পেরিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসলেন রেনগোল্ড এবং আমাকে বসতে বলে বললেন, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আপনাকে আমি 'ওডিসি'র উৎস ও মূলগত ভাব সম্বন্ধেও বলেছিলাম, কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করতে পারিনি। আমার মতে কেন তিনি দীর্ঘ দশ বছর বাড়ী ফিরতে চাননি ? কারণ, স্ত্রী পেনিলোপের সঙ্গে ইউলিসিসের সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না। যুদ্ধযাত্রার আগে থেকেই মন কষাকষি ছিল, এছাড়া, গৃহের অশান্তিই ছিল তাঁর যুদ্ধযাত্রার কারন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে মধুর ছিল না বলেই পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না ইউলিসিস।

আমি দুচোখ ভরে শুনতে লাগলাম।

তিনি বলে চললেন—তিনি ছিলেন বিচক্ষন, জ্ঞানী ও সাবধানী। পত্নীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকলে শুধু বীরত্ব খ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি ঘর ছাড়তেন না। যুদ্ধের সুযোগে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন।

আপনার উক্তি যুক্তিপূর্ণ বটে !

তাহলে স্বীকার করছেন, মনস্তত্বের উপর নির্ভর করছে সব। এখানে ওঁদের মনস্তত্বটা হচ্ছে, পেনিলোপ ছিলেন ধর্মপরায়ণা, গর্বিতা, সুগৃহিনী, জননী ও জায়া। আর ইউলিসিসের চরিত্র হচ্ছে পরবর্তী যুগের। সংস্কার মুক্ত, সুচতুর, যুক্তি পরায়ণ, বুদ্ধিমান, নাস্তিক ও সন্দেহবাদী ছিলেন ইউলিসিস।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমার ধারনা, আপনি ইউলিসিসের চরিত্র

কলঙ্কিত করেছন- 'ওডিসি' তে—

'ওডিসি' নিয়ে আমরা একটু মাথা ব্যথা করতে চাই না, 'ওডিসি'কে সম্প্রসারিত করতে আমরা' চিত্রনাট্য নির্মাণ করতে যাচ্ছি—'ওডিসি' রচিত হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ফিল্ম এখনও আরম্ভ হয়নি।

ইউলিসিসও পেনিলোপের' মধ্যে বিরোধের কারণ হলো—পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীর ট্রয়-যুদ্ধের আগে থেকেই তাঁর প্রণয়াসক্ত হয় এবং তাঁকে নানা উপহার পাঠায়। কিন্তু পেনিলোপ সেগুলো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর ইচ্ছা স্বামী এই অবাঞ্ছিত প্রার্থীদের দূর করে দেন। কিন্তু ইউলিসিস কোন কারণে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেন নি। ঝামেলা তিনি পছন্দ করতেন না, শান্তি তিনি ভালোবাসেন।

স্বামীর এই ভাব দেখে পেনিলোপ প্রতিবাদ করেন, মনে অবিশ্বাস জেগে ওঠে। কিন্তু তবুও ইউলিসিস তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নানা উপদেশ দিতেন। পেনিলোপ তাঁর স্বামীর উপদেশ মেনে ছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মনে একটা বিদ্বেষ জেগে ওঠে। ভাবেন, আর স্বামীকে ভালবাসতে পারবেন না। অবশেষে পেনিলোপ ইউলি-সিসকে মনের ভাব জানান। ইউলিসিস নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে ফিরে পেতে চান, প্রতিকার করতে চান।

কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিষময় হয়ে ওঠে তাঁর মন। এই অবস্থায় বাস করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অবশেষে ট্রয়-যুদ্ধের সুযোগে তিনি গৃহত্যাগ করেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তিনি সমুদ্রাভি-মুখে দেশের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি জানেন স্ত্রী তাঁকে ভাল-বাসে না—তাই অজ্ঞাতসারে ফিরে না যাবার অজুহাত খুঁজতে থাকেন। অবশেষে একদিন তিনি ফিরলেন ঠিকই। স্বামী প্রত্যাবর্তনের পর পতিপরায়না স্ত্রী জানালেন, একটি শর্তে স্বামীকে আবার ভালবাসবেন, পানিপ্রার্থীদের হত্যা করবে। আমরা জানি, ইউলিসিসের রক্তপিয়াসী মন নয়, তিনি ব্যাপারটা শান্তির মধ্যেই নিষ্পত্তি করতে পারলেই খুশী হবেন। বুঝলেন, পেনিলোপের প্রেম ও শ্রদ্ধা হত্যার ওপরেই নির্ভর

করছে। তাই মন স্থির করে পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করলেন এবং পেনিলোপও আর তাঁকে ঘৃণা করলেন না। তারপর দীর্ঘ বিরহের পর শুরু হলো তাঁদের প্রণয় মধুর মিলন। অনুষ্ঠিত হলো তাঁদের সত্যিকারের শোর্মিত পরিচয়।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ মলটেনি?

হ্যাঁ, বুঝেছি। এ ব্যাখ্যা শুনে মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা তীব্রতর হলো।

রেনগোল্ড বললেন, ইউলিসিস এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করলেন কেন? না করলেও তিনি পারতেন। করলেন এই কারণে, তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা প্রমাণ করলেন, তিনি শুধু শঠ, নমনীয় ও বিচক্ষণ নন, প্রয়োজন হলে যুক্তিহীন হৃদয়হীনও হতে পারেন। তিনি পেনিলোপের কাছে এটাই প্রমাণ করলেন।

রেনগোল্ডের যুক্তি চমৎকার। চুপ করে রইলাম।

বেনগোল্ড এবার উপসংহার করলেন, দেখলেন তো মলটেনি, চিত্রনাট্য পুরোপুরি—শুধু রেখায় ফুটিয়ে তুললেই হলো।

বললাম, আপনার ব্যাখা আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ, আপনার ব্যাখ্যায় ইউলিসিসের মূল চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। একটি আদর্শ পুরুষকে অতি সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে আপনি বর্ণনা করেছেন।

মুহূর্তের মধ্যে রেনগোল্ডের ঠোঁটের কোনের হাসি মিলিয়ে গেল। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন—দেখুন মিঃ মলটেনি, আপনি কিছু বোঝেন না। বুঝবেনও না। আর কেনই বা এ কথা আমি বললাম, তাও শুনে রাখুন। আপনি যেমন মনে করছেন, ইউলিসিসকে ঠিক তেমনি মর্যাদাহীন শিষ্টাচারহীন করে দেখাতে চাই না আমি, ওডিসি-তে তাঁকে যেভাবে আঁকা হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই দেখাতে চাই।

ভেবেছিলাম, আপনিও ইউলিসিসের মতো সুসভ্য ও সংস্কৃতি সম্পন্ন, কিন্তু এখন দেখছি আপনি তর্ক করছেন অমার্জিত রুচি পেনিলোপের মতো।—রেনগোল্ড আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন।

রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেল আমার মুখ। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, যদি মনে করে থাকেন, সভ্যতা-ও সংস্কৃতির অর্থ এই যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রণয়ীকে পোষণ করবে, তবে আমি অমার্জিত থাকতেই প্রস্তুত, মিঃ রেনগোল্ড—

আপনি দেখছি আজ কোন যুক্তির ধার ধারছেন না। এক কাজ করুন, বাড়ি গিয়ে শান্ত মনে আবার ভেবে দেখুন—কাল সকালে আপনার চিন্তার ফলাফল জানাবেন—কেমন ?

বেশ ! আমি ও রেনগোল্ড উঠে পড়লাম, আমি হোটেলের পথ ধরে এগোতে লাগলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

এখন আর রেনগোল্ডের ব্যাখ্যা ভেবে দেখতে ইচ্ছে করলো না। ইচ্ছে হলো, একমনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি। রেনগোল্ড বলেছেন—অব্যক্ত, অবর্ণনীয় একটা কিছু। তাই আমাকে ভেবে দেখতে হবে। স্থির করলাম বাত্তিসতার ঘরের ঠিক নিচে যে নির্জন জায়গাটা আছে ঐখানে বসে ভেবে দেখবো, আর যদি না পারি, তাহলে জলে সাঁতার কাটবো।

ছায়াঘেরা জন-বিরল পথ। যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সে-পথ ধরেই এলাম। যে রাস্তাটা গ্রীষ্মাবাসের দিকে গেছে শেষে ঐ পথই ধরে হাঁটতে লাগলাম।

গ্রীষ্মাবাসে এসে নিচের দিকে তাকালাম। তিনশো ফুট নীচে সমুদ্র কাঁপছে। চারিদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। কোথাও নীল, কোথাও সবুজ জল।

অতর্কিতে আত্মহত্যার আকাঙ্খা মনে জেগে উঠলো। আলোর এই প্রাচুর্যের মধ্যে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো। মৃত্যুই

আমার পরম শান্তি, একমাত্র কাম্য।

আত্মহত্যার প্রলোভনে উন্মাদ হয়ে উঠলাম। কিন্তু ক্ষনিকের জন্য এমিলিয়ার মুখটা এসে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভাবলাম— আমার মৃত্যু সংবাদ শুনে তা কেমন করে গ্রহণ করবে? নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম—জীবনে ক্লান্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে চাও না তুমি, আত্মঘাতী হতে চাও এমিলিয়ারই জন্য।

ভীত হলাম, বিতৃষ্ণার ভাব কেটে গেল।

সে আমায় অন্যায় ভাবে ঘৃণা করে, ভালোবাসে না, তাই অনুতপ্ত হয়ে আমি মরতে চাই।'

আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। বর্তমান অবস্থায় চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ মনে জেগে উঠলো। ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপের অবজ্ঞার কথা যখন রেনগোল্ড বলছিলেন তখন আমার মনে পড়েছে এমিলিয়ার কথা। আমি মনে কষ্ট পেয়ে প্রতিবাদ করেছি। এমিলিয়ার শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে আত্মহত্যার প্রয়োজন নেই। সেদিক থেকে পেনি-লোপের পানিপার্থীদের মত বাত্তিসতাকে হত্যা করাই উচিত। কিন্তু আমাদের এই যুগে এ সব কিছু চলবে না। সব থেকে ভালো হবে রোমে ফিরে যাওয়া। এমিলিয়ার উপদেশ না শুনে বীর ইউলিসিসের মত কাজ করবো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক! সত্যিই তো।

আর ভেবে কাজ নেই। বাড়ী ফিরে এমিলিয়াকে সব গুছিয়ে নিতে বলবো। বাত্তিসতাকে না জানিয়েই কাল সকালে চলে যাবো। বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা না করাই ভাল। তিনি চালাক, সব বুঝে ফেলবেন।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে এলোমেলো পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। একটি সরু গলি পেরিয়ে বাগান বাড়ির নিচে এলাম। খাড়া পথটি ধরে নিচের দিকে নেমে হাঁপাতে লাগলাম।

সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। ছুটি শিলাময়

অন্তরীপ চলেছে স্বচ্ছ জলের সীমানা পেরিয়ে, সূর্যালোকে জলের তলে সাদা নুড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। তারপর মরচে পড়া, ফাটল ধরা, বালি ও জলে আধো ডোবা প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর দেখতে পেলাম। ভাবলাম পাথরটার পেছনে গিয়ে শুয়ে পড়বো ঃ

সেখানে গিয়ে দেখলাম, এমিলিয়া একেবারে অনাবৃত হয়ে শুয়ে আছে।

প্রথমটা আমি এমিলিয়াকে চিনতে পারিনি। তারপর নজর পড়লো—নুড়ির উপর ছড়ানো বাহু দুটির উপর। দেখলাম, তার হাতে রয়েছে, একটি সোনার আংটি। সেটা কিছুদিন আগেই পরিণয় সূত্রে আমার কাছ থেকেই পেয়েছে এমিলিয়া। বিশাল দেখাচ্ছে তার নগ্ন দেহটি। এই প্রত্যাশিত মুহূর্তে আমার মনে বাসনা জেগে উঠল। দৈহিক মিলনের তীব্র আকাঙ্খা হল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এমিলিয়ার ওপর। সে তো রাজী হবে না।

আমি স্পষ্ট কণ্ঠে ডাকলাম, এমিলিয়া।

সে চমকে উঠলো। পেছনে তাকিয়েই জামা নেবার জন্য হাত বাড়ালো। বললাম, ভয় নেই এমিলিয়া, আমি রিকার্ডো। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তোমায় দেখছিলাম, মনে হচ্ছে আজ প্রথম দেখছি।

এমিলিয়া আর লজ্জা চাপা দেওয়ার জন্য ব্যস্ততা দেখালো না। আমাকে দেখে ওর ভয় কেটে গেছে।

বললাম, জায়গাটা খুব সুন্দর, আমিও সূর্য-স্নান করবো। মনে হয়, বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যই এই জায়গাটি তৈরী।

এমিলিয়া বলল, হ্যাঁ সত্যিই তাই।

তবে, আমাদের মধ্যে তো আর প্রেম নেই।

এমিলিয়া চুপ। পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে যে কামনা জেগেছিল আবার তা প্রবল হয়ে উঠলো।

লক্ষ্য করলাম, কেমন করে জানি না, এমিলিয়ার কাছে এসে পড়েছি, তারই পাশে বসে আছি। আমার মুখটি তার মুখের কাছে, নিশ্চল

নিদ্রামগ্ন সে। খাবার মুখে দেবার আগে ক্ষুধিত যেমন আহার্যের দিকে তাকায়, আমিও তেমনি এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেকদিন চুমু খাইনি ওমুখে। সে যদি চুমু ফিরিয়ে দেয়, তবেই তার স্বাদ ও গন্ধ হবে পুরোনো মদের মত। ধীরে ধীরে ঠোঁট লাগালাম এমিলিয়ার ঠোঁটের কাছে। চুমু খেলাম না, অনুভব করলাম তপ্ত ঠোঁটের উষ্ণতা। আস্তে আস্তে এমিলিয়ার ঠোঁটের সঙ্গে আমার ঠোঁট মেলালাম। সেই ছোঁয়া পেয়ে সে জেগে উঠলো না। বিস্ময় দেখালো না এতটুকু। আবার ঠোঁটে ঠোঁট লাগালাম, মৃদু চাপ দিলাম, আর একটু জোরে চাপ দিলাম। একটি নিবিড় চুম্বন একে দিলাম। সে মুখ খুললো ধীরে ধীরে, তার দাঁতের মাড়ির উপর এলো আমার ঠোঁট দুটি, অনুভব করলাম, একটি কোমল হাত, আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলো—

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সমাধি থেকে জেগে উঠলাম। দেখলাম, এমিলিয়া তেমনি ভাবেই শুয়ে রয়েছে। আমি তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম।

অস্ফুট স্বরে ডাকলাম, এমিলিয়া! আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি— তোমায় চুমু খাচ্ছি।

নীরব রইল এমিলিয়া। ওর মৌনতায় আমি আকাঙ্খা শেষ করলাম। প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বললাম, বাত্তিসতা কোথায়?

স্থির কণ্ঠে সে বললো, জানি না, তবে তিনি আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন না।

হঠাৎ বলে ফেললাম—দেখ এমিলিয়া, কাল সন্ধ্যায় দেখলাম, বাত্তিসতা তোমায় আদর করছে।

হ্যাঁ জানি, তুমি ত আমায় দেখেছো আর আমিও তোমায় দেখেছি।

তার স্বাভাবিকতা দেখে একটু বিব্রত বোধ করলাম? ভেবেছিলাম— শুভ্র সূর্যালোকেও সমুদ্রের নীরবতায় ঘুচে গেছে আমাদের বিরোধ, দাম্পত্য কলহ স্বাভাবিক দম্ভ ও ঔদাসীন্যের স্তরে এসে

পৌঁছেছে। তবু অতিকষ্টে বললাম—তোমার কাছে একটি কথা আছে, এমিলিয়া।

এখন নয়, আমি একটু রোদে থাকবো এখন। বিকেলে শুনবো।

ঠিক আছে। পেছন না ফিরেই বাগান বাড়ির পথ ধরে চলতে লাগলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়

লাঞ্চের সময় কোন কথাই হলো না। দুপুরের উজ্জ্বল আলো যেন বাগানবাড়ির ভেতরে এনেছে অখণ্ড মৌনতা। এমিলিয়া আর আমার মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত ব্যবধান। স্থির করেছি, বিকেলের আগে এমিলিয়াকে কিছু বলবো না। সমুদ্র-সৈকতে যে আনন্দ কৌতূহল, জড়তা ও ঔদাসীন্যে চুপ করেছিলাম, এখনও রয়েছে ঠিক সে ভাব।

লাঞ্চের শেষে এমিলিয়া বিশ্রামের জন্য আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একা একা বসে স্বচ্ছ, আলো উদ্ভাসিত আকাশের দিকে কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে চেয়ে রইলাম। তন্দ্রা এলো। ভাবলাম, রেনগোল্ডকে জানিয়ে দিয়ে আসবো আমার সংকল্পের কথা। হঠাৎ তন্দ্রার ভাব কেটে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

রেনগোল্ডের হোটেলে আসতে আধঘণ্টা সময় লাগলো। চঞ্চল হলেও যেন বেশ পরিষ্কার হয়েছে মন। স্বস্তি বোধ করলাম, আনন্দও হলো। হয়তো ঠিক পথেই চলেছি এবার।

আমরা বার-এ এসে ঢুকলাম। আর কেউ নেই এখানে। বললাম—এত শিগগির আপনার কাছে ফিরে এলাম বলে নিশ্চয় অবাক হয়েছেন আপনি। অনেক ভেবেছি এ সম্বন্ধে—আপনাকে আমার চিন্তার ফলাফল জানাতে এলাম। দেখুন, এই চিত্রনাট্য লিখতে পারবো না। চাকরী ছেড়ে দেবো।

মনেহয় রেনগোল্ডও তাই আশা করেছিলেন। . তাই বিচলিত না হয়ে বললেন, আমাদের মধ্যে আন্তরিক ও সুস্পষ্ট আলাপ হওয়া দরকার। আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলছি—ওডিসি. চিত্রনাট্য লিখবো না আমি। কারণ, আপনি যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা আমার মনঃপুত হয়নি। আপনার ওডিসি হোমরের ওডিসি নয়—হোমরের 'ওডিসি' আমায় মুগ্ধ করে, আপনার 'ওডিসি' বিরক্তি আনে।

রেনগোল্ডকে উত্তেজিত দেখালো। আমিও উত্তেজিত হয়ে গেলাম।—এ অসহ্য, হোমর যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে চিত্র রূপায়ণের অক্ষমতার জন্য হোমরের নায়ককে হীন প্রতিপন্ন করার এই সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা আমার কাছে বিরক্তিকর—আমি কিছুতেই সে কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারি না—প্রসারতা নেই আপনার পরি-কল্পনায়—এবার বুঝলেন তো, কেন এই চিত্রনাট্য রচনা করতে চাই না? আপনি কেবল টাকাটাকেই বড় মনে করেন।

নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল আমার মুখ। আবার বললাম, রেনগোল্ড। অনুভব করলাম, আমার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনা ও অনুণয়।

রেনগোল্ড আমার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করলেন। একটু পেছনে সরে এসে বিনীত কণ্ঠে বললেন—ক্ষমা করুন মলটেনি, হঠাৎ কথাটি বলে ফেলেছি।

আমি চকিত চঞ্চলভাবে বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্ষমা করলাম। আমার চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রেনগোল্ড বললেন, আপনি যে চিত্রনাট্য লিখবেন না, সেটা জানিয়েছেন বাত্তিসতাকে।

না। আপনিই তাকে বলে দেবেন। তার সঙ্গে আমার হয়তো আর দেখা হবে না। বাত্তিসতাকে বলে দেবেন, আমি একাজ করতে পারবো না—আপনারা ওডিসির যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন—আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই—আমার শরীর ভাল নেই।

ব্যক্তিসত্তা কি বিশ্বাস করবেন ?
সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।
তবু আমি দুঃখিত, আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি—আমাদের মধ্যে আপোষে মিটিয়ে নেওয়া যায় না ?
এ আপনার ভুল ধারনা, মিঃ রেনগোল্ড, আপনি চান এক, আর আমি চাই অন্য। প্রচণ্ড গরমিল আমাদের দুজনের মতের মধ্যে। তবু এখনও আমার দৃঢ় ধারণা, হোমর যেমন লিখেছেন হুবহু তেমনি করেই ওডিসি কে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করা যেতে পারে।
এটা আপনার দুর্ভাগ্য, মলটেনি ? আপনি চান হোমরের জগতের মতো একটি জগৎ, দুঃখের বিষয়, সেটা সম্ভব নয়।
হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা রেনগোল্ড, দান্তের কাব্যে ইউলিসিস সর্গটি আপনি পড়েছেন ? এই সর্গে দান্তে ইউলিসিসের মুখ দিয়ে তাঁর নিজের ও সঙ্গীদের ধ্বংসের কথা বলেছেন।
হ্যাঁ, আমি জানি।
এ অংশটি আমি আবৃত্তি করে শোনাতে পারি আপনাকে ?
বেশ তো।
আমি মুখ নীচু করে আবৃত্তি করতে লাগলাম। সহজ স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বর আমার।
আবৃত্তি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। রেনগোল্ডও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এ অংশটিই বেছে নিলেন কেন, বলুন তো ? এটি সুন্দর তবু কি উদ্দেশ্যে অংশটা আবৃত্তি করলেন ?
ঠিক তেমনি একটি ইউলিসিস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমি ? আমার কল্পনায় রয়েছে এই ইউলিসিস। আবৃত্তির মাধ্যমে সে কথাটিই বলে গেলাম।
কিন্তু দান্তে মধ্যযুগের লোক। আর আপনি হলেন আধুনিক যুগের।
এ কথার কোন উত্তর দিলাম না আর। রেনগোল্ডের হাতে হাত রেখে

বললাম, আবার কখনো আপনার সঙ্গে কাজ করবো। পরিচয় তো রইলই। আজ চলি।

তাড়াতাড়ি 'বার'-এর বাইরে এলাম। রেনগোল্ডের হাত দুখানা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। যেন বলতে চাইছেন—কেন, যাচ্ছেন কেন ?

উনবিংশ অধ্যায়

সোজা বাড়ি ফিরে এলাম। মানসিক অস্থিরতা ও বিচিত্র উল্লাসে এক মনে কিছুই ভাবতে পারি নি। কাজের সময় চিন্তায় অস্তিত্ব থাকে না। এতক্ষন কাজ করছিলাম, তাই কিছু ভাবিনি। জানতাম, কাজ হয়ে গেলেই সব কথা ভাববো আবার।

বাড়ি ফিরে শোবার ঘরে সোজা চলে এলাম। কেউ নেই। চেয়ারের ওপর একটা পত্রিকা খোলা পড়ে রয়েছে, অ্যাসট্রে থেকে অর্ধ-দগ্ধ সিগারেটের ধোঁয়া বেরোচ্ছে, রেডিওতে শোনা যাচ্ছে নাচ ও গানের চাপা আওয়াজ। শোনা গেল একটু আগেই এমিলিয়া এখানে ছিল।

ঘরটির এই আশ্চর্য্য নীরব পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করে দিল। ঘরটিকে একান্ত আপন করে নিয়েছে এমিলিয়া।

হঠাৎ মনে পড়লো, গৃহের প্রতি এমিলিয়ার অনুরাগের কথা, সে যেন একটি স্থায়ী আশ্রয় খুজে পেয়েছে এখানে। সত্য ক্যাপ্রিতে এসে এমিলিয়া খুশী হয়েছে। বাত্তিসতার বাড়িতে বাস করার সুযোগ আরও আরো বেশী তৃপ্ত হয়েছে সে! আর আমি তাকে জানাতে এসেছি যেতে হবে এবার।

উদ্বিগ্ন ভাবে এমিলিয়ার ঘরের দরজা খুললাম। এমিলিয়া নেই। বিছানার পাশে চেয়ারে তার গাউন ও শ্লিপার পড়ে রয়েছে। ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধন সামগ্রী সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। এমিলিয়ার

জুতো, জামা, রুমাল সবই এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু রোম থেকে যে সুটকেসটা সে এনেছিল তার চিহ্ন খুজে পেলাম না।

ভাবলাম, বাত্তিসতা কিংবা আমি, যাকেই সে ভালোবাসুক না কেন তাতে তার কিছু আসে যায় না। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি গৃহ, নিশ্চিন্ত নীরব শান্ত একটি আশ্রয় নীড়ই এমিলিয়ার কাছে বেশি মূল্যবান।

রান্নাঘরের দিকে গেলাম। শুনতে পেলাম এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর। সে পরিচারিকাকে উপদেশ দিচ্ছে মলটেনি সাধারন খাবারই পছন্দ করে ঝোল বা ঝাল খেতে চায় না, সেদ্ধ হলেই চলবে।

আচ্ছা এখন কী মাছ পাওয়া যায়? শোন যারা হোটেলে মাছ দেয় তাদের কাছ থেকে কাঁটা ছাড়া বেকা 'টাটকা মাছ এনে ভেজে নিতে পার, সেদ্ধ করে নিলেও চলবে। চাটনি করতে জান তো?

হ্যাঁ, জানি।

ঠিক আছে, আর সেলাড করো। শাক সবজি, গাঁজর, ডিম, যা পাওয়া যায় সব এনে বরফের মধ্যে রেখে দিও। যেন খাবার আগে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আর হ্যাঁ, রাত্রে আজ সাধারণ কিছু খাবো—ভাল দেখে মাংস এনো।

কেন জানি না, এই ঘরোয়া আলোচনা শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে পড়লো, রেনগোল্ডের সঙ্গে আলাপের শেষ অংশটুকু।

যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই যেন মনে হলো বাত্তিসতার বাগান বাড়িটি ইথাকার গৃহ এমিলিয়া পেনিলোপ, সে তার পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছে। হ্যাঁ, সবই এক কিন্তু তবু যেন তফাৎ। জানলার কাছে গিয়ে ডাকলাম, এমিলিয়া মনে আছে, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে?

হ্যাঁ, ঘরে গিয়ে বসো। এর সঙ্গে কাজটা শেষ করে আসছি।

খাবার ঘরে ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসলাম, যা বলতে যাচ্ছি তা ভেবে মনটা নিরাশ হয়ে গেল। যে বাগান বাড়িতে এমিলিয়া থাকতে চায়, সেখান থেকে চলে যাবার কথা তাকে জানাতে এসেছি। সে দুর্বিসহ পরিবেশের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল, এখন তার সঙ্গে নিজেকে

মানিয়ে নিয়েছে এনিলিয়া। তবু, এ যেন বিদ্রোহের চেয়েও অস্বস্তিকর। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য যেতে হবে। তাকে জানাতে হবে সব।

খানিক পরেই এমিলিয়া এলো। বললো, বল, কি বলতে চাইছিলে?

তোমার জিনিষপত্রগুলো বেধে নাও। আমরা কাল সকালেই রোমে ফিরে যাচ্ছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে বললাম, আমি ঠিক করেছি চিত্রনাট্যটি লিখবো না। তাই সব ছেড়ে রোমে চলে যাবো।

এমিলিয়া ভ্রু কুঁচকে বললো—কেন শুনি? বাত্তিসতা জানেন?

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার কথায়। কাল জানালা দিয়ে যা দেখেছি তারপর হয়তো—এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমি। বাত্তিসতা জানেন, তাঁকে এই মাত্র বলে এলাম।

বিরক্ত হয়েই সে বললো তুমি ভুল করেছো। কারণ ফ্ল্যাটের কিস্তি দিতে হবে। এছাড়া, তুমি নিজেই বলেছ, চুক্তি ভঙ্গ করা মানে ভবিষ্যতের পথে বাধা সৃষ্টি করবা—

আমি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, একাজ কেন করছি তা তুমি কি জান না? এ যে আমার সহ্যের বাইরে। যে ব্যক্তি আমার স্ত্রীকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে তার কাছ থেকে আমি টাকা নিই না। ছেড়ে দিচ্ছি একমাত্র তোমারই জন্য, যাতে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তোমার ধারণা ভুল। আমি তেমন লোক নই।

এমিলিয়ার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো—যদি তুমি তোমার নিজেরই জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাও তাহলে আমার কিছু নেই। আর যদি বল যে এই জন্য আমি দায়ী—তাহলে তোমার এখনও সময় আছে মত বদলাবার, এমন কাজ করলে তোমারই ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন করলাম—তারপর?

আগে বল, তোমার এই স্বার্থ ত্যাগে আমার কি লাভ ?

বুঝলাম, চরম মুহূর্ত এসেছে। বললাম, আমার এই সিদ্ধান্তে প্রমাণ করতে চাই, তুমি যেমন মনে না কর তেমন নীচ ঘৃণ্য নই আমি।

এমিলিয়া বললো—ওতে কিছু প্রমাণ হবে না—তাই বলছি—তোমার সিদ্ধান্ত ছাড়।

কী বলছ তুমি ? প্রমাণ হবে না কিছু ?

আবার বসলাম। হাত বাড়িয়ে এমিলিয়ার হাতটি ধরে বললাম—বল এমিলিয়া।

সে সুন্দর ভঙ্গীতে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। ছেড়ে দাও। আমায় ছোঁয়ার চেষ্টা করো না। আমি ভালোবাসি না তোমায়। আর পারবো না ভালবাসতে।

আমি মনে কষ্ট পেলাম। হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললাম—ও কথা রাখ, তোমার ঘৃনা সম্বন্ধেই আলোচনা হোক—এ কাজটি ছেড়ে দিলেও কি আমায় ঘৃণা করবে তুমি ?

এমিলিয়া হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল—হ্যাঁ, নিশ্চয়, এখন মুক্তি দাও আমায়। তুমি ঘৃণার যোগ্য, শত চেষ্টা করেও নিজেকে শোধরাতে পারো না। তুমি পুরুষ নও, তোমার আচরণে পুরুষোচিত প্রকাশ পায় না।

আমি তার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রাগ ও শ্লেষের সঙ্গে বললাম, তার মানে ?

বোকা কোথাকার ! জান না, তার মানে নেই কিছুই ?

সে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, যেমন করে তার অন্তর ফিরিয়ে নিয়েছে সে। এ অবজ্ঞার কোন কারণ হয়তো আছে, কিন্তু সে সেটা বোঝাতে পারছে না। আমারও কোন দোষ থাকতে পারে।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম, গত কয়েকমাস ধরে বাত্তিসতা এমিলিয়াকে প্রেম নিবেদন করছেন, আমি নিজের স্বার্থে কোন প্রতিবাদ করছি না। মনে পড়ে গেল কয়েকটি ঘটনা।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এমিলিয়া বললো—কাল সন্ধ্যায় তুমি যা দেখেছ, সত্যিকারের পুরুষ হলে তোমার মতো ব্যবহার করতে না। তুমিই আমার কাছে এসে জানতে চেয়েছিলে আমার মত—আর আমার মতটা তুমি মেনে ছিলে। তারপর জানি না জার্মানটার সঙ্গে কি কথা হয়েছে তোমার। আজ বলছো, আমারই জন্য কাজটা ছাড়ছো। তুমি ইচ্ছে হয়, পৃথিবীর সব কাজ ছেড়ে দিতে পারো, কিন্তু আমি আমার মত বদলাতে পারবো না—তোমায় ভালবাসতে পারবো না। তাই বলছি ঝামেলা না করে, আমাকে একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।

আমায় ঘৃণা করে এমিলিয়া। কিন্তু কেন? তার ঘৃণার উৎস খুঁজে পেতে চেষ্টা করলাম। তাই যথাসম্ভব শান্তভাবে বললাম—দেখ এমিলিয়া, তুমি আমায় ঘৃণার কারণটা বলছ না: আমি জানি, তোমার কথা মিথ্যা। আচ্ছা, আমি যদি কারণটা জানাই, তাহলে তুমি বলবে, আমার কথা সত্যি কি না?

এমিলিয়া স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। শ্রান্ত ও বিরক্ত কণ্ঠে বললো—কিছু বলতে পারবো না আমি দোহাই তোমায়, তুমি আমায় মুক্তি দাও। তুমি ভেবেছিলে, বাত্তিসতার চরিত্র জেনে আমি নিজের স্বার্থে তোমাকে ঠেলে দিয়েছিলাম তাই না? যদি একথা সত্যি হয়, তাহলে তুমি জেনে রেখো, ভুল করছ। কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত বাত্তিসতা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। আমায় তুমি বিশ্বাস কর, আর যদি না কর, তাহলে বুঝবো তুমি আমায় অবজ্ঞা করতে চাও। আমার কথা কিছুতেই চাও না।

তার পক্ষ থেকে উত্তর না পেয়ে হাত ধরে বললাম—বল এমিলিয়া, কেন তুমি আমায় ঘৃণা কর? তুমি ক্ষণেকের জন্য কেন ভুলতে পার না সে কথা?

এমিলিয়া মুখ ফেরালো। আরও কাছে সরে এলাম। তার বাধা না পেয়ে সাহসে ভর করে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। লক্ষ্য করলাম, চোখ থেকে জল টপটপ করে পড়ছে তার।

এইবার এমিলিয়া মুখ খুলল—তোমায় আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। আমার ভালবাসা নষ্ট করার মূলে তুমি। উঃ, কী ভীষণ ভালোবাসতাম তোমায়। কাউকে এমন ভালোবাসিনি আর বাসবোও না। তোমার স্বভাবের দোষেই সব নষ্ট হয়েছে। আমরা সুখী হতে পারতাম। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। কেমন করে সব ভুলে যাব তোমায় ঘৃনা না করে?

আমার মনে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠলো। এমিলিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—শোন, সব কিছু গুছিয়ে নাও। কাল সকালেই আমরা যাবো। রোমে গিয়ে সব তোমায় জানাবো, তাহলেই নিশ্চয়ই তোমার বিশ্বাস হবে?

সে একমনে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—না-না-না, রোমে গিয়ে কি হবে, ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে, মা আমায় চান না, ভাড়াটে বাড়িতে থেকে আবার আমায় টাইপিষ্ট হতে হবে। বাত্তিসতা বলেছেন, যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারি। আমি এখানেই থাকবো।

আমি উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠলাম, কাল সকালেই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, বুঝলে? আর যদি তুমি না যাও, তাহলে আমিও থাকবো। দেখবো, বাত্তিসতা যাতে দুজনকেই তাড়িয়ে দেন।

না, তুমি থাকতে পারবে না।

একশোবার থাকবো।

সে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিংশ অধ্যায়

উত্তেজনার মুহূর্তে বলেছি, এখানে থাকবো। বুঝলাম, এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাকে যেতেই হবে। আমার কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মনের ক্ষীণ আশাটুকু তখনও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি, তাই বলেছি, এখানেই থাকবো। দুর্গম পথের অভিযাত্রী যেন পর্বতের বিপজ্জনক স্থানে উঠে বুঝতে পারছে, জায়গাটি নিরাপদ নয়, অথচ এগোবার বা পেছোবার কোন উপায় নেই—আমার মনের অবস্থাও ঠিক তাই।

ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ ঘুড়ে বেড়ালাম। আজ আর ওদের সঙ্গে বসে থাকার ইচ্ছে নেই। ভাবলাম বাইরে কোথাও খেয়ে নেবো, দেরী করে ফিরবো। কিন্তু এই প্রখর রোদে চারবার একই রাস্তা ধরে আসা যাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই আর বেরোতে ইচ্ছা করলো না।

অবশেষে কর্তব্য স্থির করে ঘরে তালা লাগিয়ে সড়াসড়ি বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। খানিক পরে গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম।

মনে হলো রাত অনেক হয়েছে। তাই বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দেখলাম মাত্র নটা বাজে। ভাবলাম, ডিনারের টেবিলে গিয়ে বাত্তিসতার সঙ্গে ঝগড়া করবো, যাতে তিনি ঘর থেকে বার করে দিতে বাধ্য হন।

খাবার ঘরে এসে দেখলাম কেউ নেই। পরিচারক জানালো, এমি-লিয়া আর বাত্তিসতা বেড়িয়েছে, ইচ্ছে হলে আমি রেস্তোরায় গিয়ে দেখা করতে পারি। নয়তো ঘরেও যেতে পারি।

ইচ্ছা, বিরক্তি বা হতাশা জাগলো না মনে, অসহ্য মর্মবেদনা অনুভব করলাম। এ যেন আমায় তাড়াবার একটা ছুতো।

পরিচারকে জানালাম, আমি এখানেই খাবো। খাবার টেবিলে এসে বসলাম। খাওয়া শেষ করে পরিচারককে ছুটি দিয়ে বারান্দায় এলাম। অন্ধকার অদৃশ্য সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। যা ভেবেছিলাম তা হয়নি, আমাদের অতীত সম্পর্কটুকু অনুধাবন করলেই হয়তো আমার উপর এমিলিয়ার বিদ্বেষের কারণ নির্ণয় করতে পারতাম। কিন্তু এমিলিয়া তা চায় না, সে চায় অকারনে ঘৃণা করতে, আমার ভালবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে।

বুঝলাম, কোন সত্য বা কাল্পনিক যুক্তি নেই তার এ ঘৃণার। জানি না আমার আচারণ সেজন্য দায়ী কিনা। কষ্টি পাথরে ঘষে কোনো সোনা খাঁটি কিনা যাচাই করে নেওয়া যায়। ঠিক তেমনি দুটি চরিত্রের দৈনন্দিন সংঘর্ষ থেকেই জন্মেছে তার সত্য ধারনা। বাক্তিসতার সঙ্গে তার ব্যবহার সম্পর্কে আমি যে অমূলক সন্দেহ করেছি তাতেই আমায় অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করছে এমিলিয়া। অবশ্য সে কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করে ছিল।

প্রথম থেকেই সে যেন ধারণা করে এসেছে আমি এমনিই, ঘৃনাই আমার ন্যায্য পাওনা। হয়তো অন্য ভাবে সে বিচার করেছে আমার। এমিলিয়ার অদ্ভুত আচরণই তার প্রমাণ। গোড়া থেকেই যে প্রতিরোধ করতে পারতো এই ভুল বোঝাবুঝি স্পষ্টভাবে সব কথা বলে অটুট রাখতে পারতো আমাদের প্রণয় সম্পর্কে। প্রতারিত করতে চায় সে, সে চায় আমায় ঘৃণা করতে।

মনে চিন্তা ও উত্তেজনা অসহ্য হওয়ায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রাত্রি মৌন শান্তির কথা ভেবে নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। আমি যেন স্বস্তি পাবার যোগ্য নই। আমি অবহেলার পাত্র, শান্তি পাবো কেমন করে? শান্তির আশা নেই আমার জীবনে।

আবার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালাম না। আমি ঘৃণার পাত্র হলেও নগণ্য নই, বুদ্ধিভ্রংশ হইনি। এমিলিয়া আমার গুণ স্বীকার করেছে। এই তো আমার গর্ব। স্থির চিন্তা ও বুদ্ধি না প্রয়োগ করলে

এই অকারণ অবমাননার বোঝা আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ভাবতে লাগলাম, কেন--কেন আমার এই ঘৃণ্য অবস্থা? মনে পড়লো ইউলিসিসের সঙ্গে পেনিলোপের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আমারই সঙ্গে এমিলিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে রেনগোল্ড যে কথাগুলি বলেছিলেন--ইউলিসিস হচ্ছেন সুসভ্য পুরুষ, আর পেনিলোপ আদিম নারী—

হ্যাঁ, ইতিহাস আমাকে সুষ্ঠু আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু এখন যে অবস্থায় রয়েছি তার যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই করি না কেন— সে অবস্থায় বাস করতে চাই না আমি।

তবে এমিলিয়া আমায় কেন ভালোবাসে না? কেন সে ঘৃণা করে? তাতে কি লাভ তার? মনে পড়ে গেল, তার পরিস্কার উচ্চারণ—তুমি পুরুষ নও! এই উক্তিটির মধ্যেই ফুটে উঠেছে এমিলিয়ার কল্পিত আদর্শ পুরুষের মূর্তি। এই হলো তায় ঘৃণার মূল। এরূপ শুধু তার কল্পনায় গড়া নয়। যে পৃথিবীতে সে এতদিনে বাস করে আসছে তার সংস্কার থেকেই এর জন্ম। তার প্রমাণ পেয়েছি বাত্তিসতার প্রতি এমিলিয়ার শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টি থেকে, আর তার আত্মদানের দৃশ্য দেখে। বাত্তিসতার জবাবের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছে। সারল্য ও অস্পষ্টতা সত্বেও এমিলিয়া আমায় ঘৃণা করে। জানি না, স্বার্থের খাতিরে আমি বাত্তিসতাকে সমর্থন করি—এ সন্দেহ সে পোষণ করে কিনা। যদি তাই হয়, তবে সে ভেবেছে—রিকার্ডো বাত্তিসতার মুখাপেক্ষী, বাত্তিসতা আমায় প্রেম নিবেদন করছে, রিকার্ডো চায়—আমি বাত্তিসতার উপপত্নী হই।

আশ্চর্য, আমি আগে একথা ভাবিনি কেন? বাত্তিসতা ও রেনগোল্ড ওডিসির যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বুঝেছি—তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কেন বুঝতে পারিনি এমিলিয়াও ঠিক তাঁদেরই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার মূর্তি কল্পনা করে, তফাৎ শুধু এই যে—ওরা দুটি কাল্পনিক মূর্তির সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু অবজ্ঞার ভেতর দিয়ে

এমিলিয়া প্রকাশ করেছে, তার মনের ভাব।

এমিলিয়া সরল প্রকৃতির, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে ঔদ্ধত্য। হোমর ও দান্তের স্তরে সে উঠতে পারে না, কারণ সে আদর্শের জগতে বাস করে না, বাস করে—বাত্তিসতা ও রেনগোল্ড-এর মতো লোকের জগতে।

তবু—এই এমিলিয়াই ছিল আমার স্বপ্ন। আর আজ সেই বিচার করছে, একটা সামান্য ব্যাপারে আমাকে ঘৃণা করছে। আমার অভীপ্সিত যে জগৎ—যার অস্তিত্ব নেই, সেখানে নিয়ে আসতে হবে এমিলিয়াকে, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে একটি জগতের সঙ্গে।

হ্যাঁ, মনের সঙ্কোচ কাটিয়ে ফেলতে হবে। এমিলিয়াকে বুঝিয়ে দিতে হবে—আমার আচরণের জন্য নয়, প্রকৃতিগত দুর্বলতার জন্যেই সে ঘৃণা করে আমায়।

বাত্তিসতা, রেনগোল্ড ও আমি ইউলিসিসকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিছি। কারণ, আমাদের জীবন ও আদর্শও স্বতন্ত্র। বাত্তিসতার ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শ বা স্বার্থের সঙ্গে মিল রেখেই তিনি কল্পনা করেছেন ইউলিসিসকে। রেনগোল্ড-এর কল্পিত রূপ আরও বাস্তব ও স্থূল—তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারই অনুকূল, আর আমার রূপ হলো—মহান অথচ স্বাভাবিক, বাস্তব। অর্থ যে জীবনকে কলঙ্কিত বা সঙ্কুচিত করতে পারে না কিংবা সে জীবন কখনও সম্পূর্ণ দৈহিক ও পার্থিব স্তরে নেমে আসে না—তেমনি একটি জীবনের নিষ্ফল অথচ আন্তরিক অভিলাষ থেকেই আমার এ রূপ কল্পনা।

হয়তো চিত্রনাট্য ফুটিয়ে তোলা যাবে না এ রূপ, তবু ঠিক তেমন জীবন-যাপনের চেষ্টা করতে হবে আমাকে। এমনি করেই ফিরিয়ে আনতে হবে এমিলিয়ার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

কিন্তু কেমন করে? কী উপায়ে?

আরো বেশী তাকে ভালোবাসতে হবে। যখন চাই, যতবার প্রয়োজন, ততবার। আমার প্রেমের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতার প্রমাণ দিতে হবে।

তবে হ্যাঁ, এখন এমিলিয়াকে জোর করলে ভালো হবে না। আজ এখানেই থাকবো, কাল চলে যাবো। রোম-এ গিয়ে চিঠি লিখে জানাবো সব কথা—যা মুখে বলতে পারিনি।
এমিলিয়া ও বাত্তিসতার কণ্ঠস্বর বারান্দার নীচে শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। মনে হল ওরা—ওরা দুজনে বাগান বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আমার চারদিকে গুঞ্জন করবে। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুচোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। আর কানে এসে পৌছোলো না বাত্তিসতা ও এমিলিয়ার গুঞ্জন-রব।

একবিংশ অধ্যায়

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যালোক চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভাঙলো। বেশ বেলা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে চারদিকের মৌনতার ভাষা শুনলাম। সেখানকার পরিপূর্ণ পবিত্রতার মধ্যে যেন রয়েছে অতীত ক্ষত ও বেদনার প্রতিধ্বনি। বিছানায় কান পেতে আরো মন দিয়ে শুনলাম।
হঠাৎ কি একটা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাববোধ করলাম। এ যেন লোকালয়ের নীরবতা নয়, জড় জগতের নির্জনতা। বিছানা থেকে প্রায় ছুটে এমিলিয়ার দরজার সামনে গেলাম। দরজা খুলতেই পরিত্যক্ত, অবিন্যস্ত বিছানার উপর মাথার বালিশের নীচে একটা চিঠি দেখতে পেলাম। পড়লাম—
প্রিয় রিকার্ডো।
তুমি যেতে চাও না বলে আমিই চলে যাচ্ছি। একা যাওয়ার সাহস হতো না। বাত্তিসতা যাচ্ছেন বলে সেই সুযোগটাই গ্রহণ করলাম। তাছাড়া, একেবারে নিঃসঙ্গ হওয়ার চেয়ে বাত্তিসতার সঙ্গ খারাপ নয়।

রোম-এ গিয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবো, নিজেই নিজের জীবিকা উপার্জন করবো। আর যদি শুনতে পাও, বাত্তিসতার উপপত্নী হয়েছি, তাহলে একটুও অবাক হয়ো না যেন। কারণ আমিও তো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তখন জেনো যে নিজেকে বাঁচাতে পারিনি। বিদায়—

এমিলিয়া।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বিছানার ওপর বসে রইলাম। এক-বার চোখ বুলিয়ে ঘরের চারিদিকটা দেখলাম। সবই এলেমেলো, ফাঁকা, এমিলিয়ার কোন জিনিষই নেই। ক'দিন ধরে যে বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছি, সেই বিপদ আজ এসেছে। সত্যিই হঠাৎ আমি ছিন্ন-মূল হয়ে পড়েছি, বৃক্ষের মতো আমার মূল উৎপাটিত হয়েছে, আমার মাটি—এমিলিয়া—যে তার প্রেম দিয়ে মূলগুলিকে সতেজ ও সজীব করে-ছিল। দূরে সরে গেছে আজ। মূল আর প্রেমের স্পর্শ পাবেনা, আহরণ করতে পারবে না মাটির রস সুধা, নিষ্প্রাণ শুষ্ক হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। বিষণ্ণ, ব্যাথিত মনে ঘরে চলে এলাম। আমি যেন অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ ধপ করে নিচে পড়েছি। নিদারুণ ব্যথা বুকে অনুভব করলাম। বাইরে এসে একটা খবরের কাগজ নিয়ে কাফেতে এসে বললাম। কী আশ্চর্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সংবাদপত্র পড়া শেষ হয়ে গেল। নিষ্ঠুর শিশু যখন মাছি ধরে তার মাথাটি ছিঁড়ে ফেলে, তখন মাছিটি কিছুই টের পায় না, যখন কিছুটা এগিয়ে যায়, তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমারও অবস্থায় ঠিক মাছির মত।

দুপুরবেলা সমুদ্রতীরগামী বাসে চড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই রোদভরা ফাঁকা মাঠ চোখে পড়লো। ধীরে ধীরে স্নানের ঘাটে এসে নিচের সিঁড়িতে নেমে এলাম। সাদা বেলাভূমি, প্রশান্ত নির্মল আকাশের নিচে নীল সমুদ্র স্থির, দিগন্তলীন।

সমুদ্রের জল রেশমের মতো চকচক করছে। পাঁকগুলি আলস্যভরে ঘুরে ঘুরে চলেছে। ভাবলাম, নৌকায় চড়বো। দাঁড় টানলে মনের চিন্তা কমে যাবে, তাছাড়া একা একা থাকবার সুযোগ পাবো। বৃদ্ধ

রক্ষী মাথার খড়ের টুপিটি চোখের ওপর টেনে নিয়ে নৌকাটি অর্ধেক জলে ঠেলে দিয়ে নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলাম—নৌকায় স্থিরভাবে বসে আছে এমিলিয়া। আমার বিস্ময় দেখে সে মুখ টিপে হাসছে, চেয়ে আছে আমার চোখে চোখে। চোখের নীরব ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে—আমি এখানেই রয়েছি, কিছু বলো না আমায়—আজ কোন কথা নয়।

তার অপ্রকাশিত আদেশ আমি পালন করলাম। মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। নৌকায় উঠে ঘাড় নীচু করে দাঁড় টানতে লাগলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই নৌকা অন্তরীপে এসে পৌঁছালো। আমি এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না।

দাঁড় টানতে টানতে বিচিত্র অভিনব আনন্দের সঙ্গে মেশানো বেদনার অনুভূতিতে দুচোখ বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রু।

অন্তরীপের অপরদিকে উজান স্রোত লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। ডান দিকে একটি নিচু কালো পাহাড় চূড়া দেখা যাচ্ছে জলের উপর। বাম-দিকে, অন্তরীপের পেছনে উঁচু পাথরের প্রাচীর। পাহাড়টি যেখানে ডুবে রয়েছে সেখানে জল সাদা, ভাঁটার টানে সামুদ্রিক শেওলার সবুজ অশ্রু দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র বক্ষও নির্জন, শরনার্থীর ভিড় নেই, নৌকা নেই। উজ্জ্বল ঘন নীল জল দেখে মনে হয় গভীর। আরো দূরে অন্তরীপের সারি—কাল্পনিক রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের মতো।

নৌকার গতি কমিয়ে এমিলিয়ার দিকে এলাম। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কাঁদছ কেন ?

বললাম, আনন্দের আতিশয্যে। ভেবেছিলাম, তুমি আমায় একা ফেলে চলে গিয়েছো।

চেখে নামিয়ে এমিলিয়া বললো, যাবোই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বাত্তিসতার সঙ্গে স্টিমার ঘাট পর্যন্ত এসে রয়ে গেলাম। শেষ মুহূর্তে ঠিক করলাম, যাবো না।

বাগানবাড়িতে টেলিফোন করে জানলাম, তুমি বেরিয়েছো, ভাবলাম,

এখানেই এসেছ, তাই এলাম। দেখলাম, তুমি নৌকা আনতে বলছ। একটু রোদে শুয়েছিলাম, আমার পাশ দিয়ে চলে গেলে, দেখতেই পেলে না আমায়। তারপর তুমি যখন কাপড় পাল্টাচ্ছিলে তখন আমি এসে বসলাম নৌকায়।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, বাত্তিসতার সঙ্গে গেলে না কেন ?

ভেবে দেখলাম, ভুল করেছি। সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়—

কী দেখে বুঝলে ?

তা ঠিক জানি না। হয়তো কাল সন্ধ্যেয় তোমার গলার আওয়াজ শুনে—

তবে কি তুমি সত্যই বুঝেছ—আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ভিত্তি-হীন ? তুমি কি মনে কর না—আমি ঘৃণ্য ? বল—বল এমিলিয়া। এই কি তোমার শেষে কথা ?

ভেবেছিলাম, তুমি কি একটা করেছিলে—আর তাই আমার শ্রদ্ধা হারিয়ে ছিলে, কিন্তু এখন জেনেছি—সরই ভুল বোঝাবুঝি।

তুজনের মুখে আর কোন কথা নেই।

আমার দেহে যেন দ্বিগুন শক্তি ফিরে এসেছে, মনে স্ফূর্তির সীমা নেই। জোরে জোরে দাঁড় বাইতে লাগলাম। উষ্ণতায় শিহরণ জাগলো সর্বাঙ্গে।

সবুজ গুহার বিপরীত দিকে এসে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাস ?

এমিলিয়া একটু ইতস্ততঃ করে বললো—চিরদিনই তোমায় ভালো-বেসেছি, ভালোবাসবো চিরদিন—

কিন্তু একী ? তার মুখে বেদনার ছাপ কেন ?

বললাম—কথাগুলো অমন বিমর্ষভাবে বলছো কেন ?

জানি না, হয়তো, তার কারন, যদি তুজনের মধ্যে এমন ভুল বোঝাবুঝি না হতো তাহলে ভালোবাসা আগের মতো থাকতো।

হ্যাঁ, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এখন তো আর ভুল বোঝাবুঝি নেই—

ও কথা আর না ভাবাই উচিত। এখন থেকে অবিচ্ছেদ্য হবে আমাদের প্রেম-বন্ধন, কি বল ?

এমিলিয়া কেবল ঘাড় নেড়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

দাঁড়টানা বন্ধ করলাম। আবছা অন্ধকারে নির্জন ডাঙা আছে লাল গুহার। সেখানে গিয়ে নতুন করে আরম্ভ করবো সেই পুরোনো জীবন, চালাবো বাধাহীন প্রেমলীলা।

এমিলিয়া লজ্জা মাখা মুখটা তুলে একবার তাকাল। ঘাড় নেড়ে জানাল নীরব সম্মতি। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এমিলিয়া, চোখে কামনার আকুলতা, সে যেন আত্মদানের চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে।

লাল গুহায় এসে নৌকোটা টেনে আনলাম ভেতরে। অন্ধকারের মধ্যে নৌকাটি আর দেখতে পেলাম না আর। দাঁড় ছেড়ে দিয়ে বললাম. তোমার হাতটা দাও—আমার হাত ধরে নেমে এসো—

কোন সাড়া পেলাম না।

ডাকলাম, এমিলিয়া, হাত ধর।

হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। অন্ধকারে হাতড়ে দেখলাম। কোথায় গেল এমিলিয়া ? বুক কেঁপে উঠলো। এমিলিয়া! এমিলিয়া! প্রতিধ্বনি শুনলাম, নৌকাটি স্থিরভাবে রয়েছে সৈকতের ওপর, বেশ অন্ধকার, ঝির ঝির করে জল ঝরছে উপর থেকে, নৌকোয় কেউ নেই—জন-মানবের চিহ্ন নেই কোথাও, আমি কেবল একা।

আকুল কণ্ঠে আবার ভাবলাম, এমিলিয়া, তুমি কোথায় ?

তক্ষুনি আমার ভুল ভেঙে গেল। নৌকো থেকে নেমে ভিজে নুড়ির উপর মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়লাম। হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নৌকা বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। ঘড়ি দেখলাম—তুটো বাজে। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশী সময় কাটিয়েছি গুহার মধ্যে।

বুঝলাম—সেই মধ্যাহ্নে এক ছায়ামূর্তির সঙ্গে কথা বলেছি, তারই কাছে ফেলেছি নিস্ফল অশ্রু।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে আসতে লাগলাম, স্নানের ঘাটের দিকে। মাঝে মাঝে দাঁড় যেমন বন্ধ করে দাঁড়টি হাতে নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ে রইলাম রৌদ্রদীপ্ত নীল সমুদ্রের শান্ত বুকের দিকে।

আমার যেন মতিভ্রম ঘটেছে। দুদিন আগেও এমন হয়েছিল। দেখেছিলাম— এমিলিয়া রোদে শুয়ে আছে। আমি তাকে চুমু খাচ্ছি। কিন্তু সে ছিল আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে। আজকের এই ভ্রমটা আরো স্পষ্ট। না-না, এ শুধু ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আলেয়ার সঙ্গে কথা বলেছি আমি, এমিলিয়াকে যা বলতে চেয়েছি তাই বলেছি তাকে। এমিলিয়ার কাছ থেকে যা শুনতে চেয়েছি, শুনেছি তাই, তাকে যেমন ভেবেছি—দেখেছি ঠিক তেমনি ভাবেই। কিন্তু এখনও কাটে নি সেই মায়া ঘোর। ভাবতে লাগলাম, এ সম্ভব কিনা।

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ স্বপ্ন দেখে লোকে যেমন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, পুলকাবিষ্ট হয় সে কল্পনার গরিমসি করে, ঠিক তেমনি আমার মনে হলো— এ মায়া নয়, সত্য। মনের আনন্দে স্মরণ করলাম, সে দৃশ্য। হোক সে আলেয়া, আমার কাছে এ ঘটনা সত্য।

অশ্রান্ত, অনাবিল, অনির্বচনীয় তৃপ্তি ভরে ভাবতে লাগলাম। এ যেন আমার মনের গোপন আকাঙ্খারই প্রতীক! স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব মনে হলো। গুহায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি কি দেখেছিলাম, এমিলিয়ার প্রেতাত্মা এসেছে আমার কাছে, না স্বপ্ন দেখছিলাম?

বারবার একই চিন্তা মনে জাগতে লাগলো, আমি কি স্বপ্ন দেখেছি, না মায়ায় বিভ্রান্ত হয়েছি, না আলেয়া দেখেছি? না, এ রহস্য সমাধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অবিলম্বে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা জাগলো। কেন জানি না, ভাবলাম, বাড়ি গেলে এ রহস্যের সমাধান হবে। ছটার ষ্টিমার ধরে ফিরতে হবে।

তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ী ফিরে এলাম।

নির্জন খাবার ঘরে এসে ঢুকেই টেবিলের ওপর একটা টেলিগ্রাম দেখতে পেলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হলদে খামটা খুললাম। নীচে বাত্তিসতার নাম দেখে অবাক হয়ে গেলাম। টেলিগ্রামটি পড়লাম দুর্ঘটনায় আহত এমিলিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক -বাত্তিসতা।

মাথায় নিমেষের মধ্যে রক্ত উঠে গেল

সেদিন বিকেলেই নেপলস-এ গিয়ে জানলাম মোটর দুর্ঘটনায় এমিলিয়া মারা গেছে। বিচিত্র তার মৃত্যু। বুকের ওপর চিবুক রেখে মাথা নীচু করে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাত্তিসতা যথারীতি গাড়ী চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা গরুর গাড়ি সামনে পড়লো, বাত্তিসতা খুব জোরে ব্রেক চাপলেন, ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে একবার ঝুঁকে পড়লো এমিলিয়া। গাড়োয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে গাড়ি চালিয়ে দিলেন বাত্তিসতা। কিন্তু এমিলিয়া কোন কথা বলল না, বাত্তিসতার কথার কোন উত্তর দিল না।

গাড়িটি বাঁক নিতেই, এমিলিয়া বাত্তিসতার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। গাড়ি থামিয়ে বাত্তিসতা দেখলেন-দেহ নিস্প্রাণ। হঠাৎ ব্রেক-এর চাপে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগে এমিলিয়ার মেরুদণ্ডের শিরা ছিঁড়ে যায়। ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এমিলিয়া।

অসহ্য গরম—শোক অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কারণ, শোক চায়—মনে একাধিপত্য করতে, অন্য কোন ভাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায় না।

দিনটা ছিল গুমোট। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে স্যাঁতসেঁতে থমথমে আবহাওয়ায় শেষ হলো এমিলিয়ার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করলাম। আজ মনে হলো এ ঘরটি চিরকালের জন্য অপ্রয়োজনীয়।

সত্যিই এমিলিয়া নেই, ও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে গেছে সে, তাকে এ জীবনে আর খুঁজে পাবো না কোথাও। এতটুকু হাওয়া নেই বাইরে। তবু জানালাগুলি খুলে দিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলাম।

নিঃশব্দে, নিস্তব্ধ, প্রকৃতি। দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন।
পাশের বাড়িগুলোর খোলা জানলা দিয়ে উজ্জ্বল আলো চোখে পড়লো। ঘরে ঘরে লোকজন ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে। আনন্দে মেতে রয়েছে। চঞ্চল উন্মাদ হয়ে উঠলো আমার মন। কল্পনার চোখে ভেসে উঠলো একটি জগৎ। সেখানে লোকে ভুল না বুঝে শুধু ভালবাসে, বিনিময়ে পায় ভালবাসা, নিরবিচ্ছন্ন শান্তি ও সুখময় জীবন যাপন করে, আর যে জগৎ থেকে আমি হয়েছি চির নির্বাসিত। আবার সে জগতে প্রবেশ করতে হলে চাই এমিলিয়ার জবাব, আমার নির্দোশিতা সম্বন্ধে অবিচল বিশ্বাস? আর চাই-অলৌকিক প্রেম। সে প্রেম শুধু আমাদের প্রাণে জাগিয়ে তুললে চলবে না, জাগাতে হবে অপরের প্রাণেও—কিন্তু আর তা তো সম্ভব নয়।
ভাবলাম, এনিলিয়ার মৃত্যু আমার প্রতি তার চরম শত্রুতারই নিদর্শন। আমি যেন উন্মাদ হয়ে যাবো—যেন আর বাঁচতে পারবো না—
কিন্তু বেঁচে রইলাম—পরদিন আবার স্যুটকেশটি হাতে নিয়ে বাইরে এসে ঘরের দরজায় তালা লাগালাম। দারোয়ানের হাতে চারিটি দিয়ে বললাম, ক'দিন পরে ঘুরে এসেই ঘরটি ছেড়ে দেবো।
আবার ক্যাপ্রিতে ফিরে এলাম। সেখানে এমিলিয়া আমার শেষ দেখা দিয়েছিল হয়তো সেখানে, কিংবা আর কোথাও, আবার সে দেখা দেবে আমায়। তখন তাকে বলবো—কেন ঘটেছিল এত সব ঘটনা, আবার তাকে জানাবো আমার প্রেম, সে দেবে প্রেমের প্রতিশ্রুতি, ভালবাসবে আমায়।
জানতাম, আমার এ আকাঙ্খা ও একটা উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, বাস্তব মায়ার প্রতি সমান আকর্ষণে এমন যুক্তিপূর্ণ উন্মাদনা আর জাগেনি কখনও।
নিদ্রায় বা জাগরণে এমিলিয়া আমায় দেখা দেয়নি আর। কিন্তু সে যখন আমায় শেষবার দেখা দেয়—সেই সময়ের সঙ্গে তার মৃত্যু সময়ের কোন মিল ছিল না। যখন এমিলিয়াকে নৌকার উপর দেখেছিলাম

তখনও সে বেঁচেছিল, যখন আমি মূর্চ্ছিত হয়ে সৈকতের উপর পড়ে গিয়েছিলাম তখনই হয়তো সে মারা যায়। সুতরাং তার মৃত্যু ও জীবনে সত্যিকারের কোন সঙ্গতি ছিল না।

কখনও জানতে পারবো না, কী হয়েছে এমিলিয়া—আলেয়া, মায়া, স্বপ্ন, না আর কিছু। যে অনিশ্চয়তা জীবনে আমাদের সম্পর্ক বিষময় করেছিল, এমিলিয়ার মৃত্যুর পরেও তা রয়ে গেছে।

এমিলিয়াকে দেখবার আশঙ্কায় ও সেখানে তাকে শেষ বার দেখেছি যে জায়গাগুলি দর্শনের আকুলতায় একদিন এলাম বাগান-বাড়ির নিচে সৈকত ভূমিতে—যেখানে তাকে নগ্ন অবস্থায় শায়িত দেখেছিলাম, চুম্বনের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

নির্জন সমুদ্র তট। পাথরের স্তূপের ভেতর দিয়ে এসে চোখ তুলে চাইলাম—হাস্যময় অনন্ত বিস্তার নীল সিন্ধুর দিকে।

মনে পড়ে গেল—ওডিসির কথা, ইউলিসিস ও পেনিলোপের কথা। ইউলিসিস ও পেনিলোপের মতো আমার এমিলিয়াও হয়তো চির-বিশ্রাম সুখ ভোগ করছে।

বিশাল জলধির বুকে লীন হয়ে গেছে, অনন্তকালের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

এমিলিয়াকে আবার খুঁজে নেওয়া ও নিশ্চিন্তে বসে তার সঙ্গে পার্থিব আলাপ-আলোচনা করা নির্ভর করছে আমারই ওপর স্বপ্ন বা আলোর ওপর নয়।

আবার তার দেখা পেলেই তো সে মুক্তি পাবে আমার কাছ থেকে, চলে যেতে পারবে আমার উত্তেজনার সীমানা ছাড়িয়ে, সান্ত্বনা ও সৌন্দর্যের মূর্তির মত পলকহীন নেত্রে আমার মুখের দিকে চিরদিন চেয়ে থাকবে!